৩ ১ ২ ৩ ১
। ণা পা I মা -া পা । র্সা -া । ণধা পা I পা মা রা ।
০ রা ম ০ গ নে ০ আং হা র আ র

২ ৩ ১ ২ ৩
। মা -া । না সা I রা -মা -পা । -মা -রা । মা মা II II
তি ০ গ গ নে ০ ০ ০ ০ "এ কি"

আমার বিবাহ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কুড়ি দিন কাটিয়া গেল। বাবা মা, সরযু ও ললিতকে লইয়া কাশী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মা আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "বাছার মেসে খেয়ে সুবিধা হ'ত না, তাই রোগা হয়ে গিয়েছে!" বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর কি এর মধ্যে অসুখ হয়েছিল? এরূপ চেহারা খারাপ হ'ল কিসে?"

আমি "না, আমার কোন অসুখ হয় নাই," বলিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে সরিয়া গেলাম।

বাবা পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছিলেন যে, পরীক্ষার পরেই আমার বিবাহ দিবেন। তাই তিনি নানা স্থানে পাত্রীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আমি কিন্তু মায়ের নিকট বার বার বলিয়া আসিতেছিলাম যে, আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না।

আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, অমিয়ার সহিত যদি বিবাহ হয়, তবেই বিবাহ করিব; তাহা না হইলে এ-জীবনে আর বিবাহই করিব না। আমি এটি বেশ বুঝিয়াছিলাম যে, যাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসা যায়, তাহাকে ছাড়া অন্য আর কাহাকেও সেরূপ ভালবাসা যায় না। এ জগতে যাহাদিগকে এইরূপ ভালবাসার স্থান পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায়, তাহাদিগের হৃদয় কিরূপ, জানি না। যে পুরুষ তাহার প্রথম পরিণীতা বধূর নিকট দিবানিশি বলিয়া আসিয়াছে যে, জগতে তাহাকে ছাড়া তাহার ভালবাসিবার আর কিছুই নাই, সে যদি সেই স্ত্রীর মৃত্যুর পরই পুনরায় দার-পরিগ্রহ করে, এবং এই বধূকেও সেই কথাই বলিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার দ্বারা তাহার পূর্ব্ব স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা কপটতামাত্র কি না তাহা সকলের বিবেচ্য। অমিয়ার প্রতি আমার ভালবাসা স্বচ্ছ বারিধির ন্যায় নির্ম্মল ও গভীর। তাই আমি তাহাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করার কথা একেবারে মনে স্থান দিতেই পারি নাই।

বাবা এ-দিকে একটি পাত্রী পছন্দ করিয়া আমার বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন। এ-কথা শুনিয়া আমার যে কিরূপ দুঃখ ও রাগ হইয়াছিল, তাহা দু'এক কথায় বর্ণনা করা যায় না। আমি সেই-দিনই রাত্রিতে মাকে

বলিলাম যে, তাঁহারা যদি আমার বিবাহ দিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমি নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইব। এ-কথাতে মাতা কত অশ্রুপাত করিলেন, কত বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই আমাকে তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত করাইতে পারিলেন না। মা মনে ব্যথা পাইয়াছেন, জানিয়া মনটা আরও খারাপ হইয়া গেল।

পরদিন বাবা আমার বাল্যবন্ধু পরেশকে ডাকাইয়া আমার এইরূপ বৈরাগ্যের কারণ জিজ্ঞাসা করাইলেন, কিন্তু সেও সন্তোষজনক কোন কারণ দেখাইতে পারিল না। কারণ, আমার মনের কথা আমি এতদিন কাহাকেও বলি নাই। সে-দিন হইতে পরেশ আমার পিছু লাগিল। প্রতিদিন আমাকে সে বিরক্ত করিতে লাগিল। পাছে কোন দিন অন্য বন্ধুর সামনে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলে, এই ভয়ে একদিন আমি তাহাকে নানাপ্রকার প্রতিজ্ঞা করাইয়া সমস্ত কথা বলিলাম। পরেশ আমার কথা শেষ হইলে খুব খানিকটা ভীষণভাবে হাসিল এবং পরে বলিল, "আচ্ছা এর প্রতিকার হচ্ছে।" আমি ভাবিলাম, পরেশ নিশ্চয়ই তাহা হইলে এ-কথা প্রকাশ করিবে। ইহাতে ভয় হইল। আমি তাহার পায়ে পড়িলাম এবং বলিলাম, "দেখ পরেশ, যদি তুমি এ-কথা প্রকাশ কর, তাহা হইলে চিরদিনের তরে আর আমি তোমার মুখ দেখিব না।" সে কিছুতেই কাহাকে বলিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া গেল, কিন্তু পরে যাহা ঘটিল, তাহাতে বুঝিলাম যে সে তাহার প্রতিজ্ঞা রাখে নাই।

দিন-কতক সকলকেই বেশ চুপ্ চাপ্ দেখিয়া আমি ভাবিলাম, পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী বলিয়া এ-সময়ে বাবা কিংবা মা আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে ইচ্ছুক নন্। কিন্তু একদিন সন্ধ্যার পর সরকারী উদ্যান হইতে বেড়াইয়া আসিয়া দেখি যে, বাহিরবাড়ীর ঘরে আমার বিছানার উপর রামদুলালবাবু বসিয়া আছেন এবং বাবা চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর একখানি কাগজে কি লিখিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই রামদুলালবাবু বলিলেন, "কিহে সতীশ, কেমন আছ?"

একে রামদুলালবাবুর হঠাৎ আগমন, তাহাতে আবার আমাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন! আমার ত শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল। আমার মনে হইল, "তবে কি পরেশ আমার কথা বাবা কিংবা মা'র নিকট প্রকাশ করিয়াছে?" এ-কথা মনে হইতেই লজ্জা এবং পরেশের প্রতি রাগ, এই দুইটিই একসঙ্গে আসিয়া আমার মনকে আক্রমণ করিল; এবং একটু যে আনন্দ তাহার সহিত একেবারে যোগ দিল না, তাহা নহে। দিনকতক আমি মুখ তুলিয়া মা কিংবা বাবার সহিত কথা বলিতেই পারিলাম না। পরেশের প্রতি তখন ক্রুদ্ধ হইলেও এখন দেখিতেছি পরেশই আমার প্রকৃত বন্ধু।

পরীক্ষার দিন-কতক পূর্ব্বে শুনিলাম যে আমার বিবাহের ঠিক হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষা যে-দিন শেষ হইবে, তাহার চারি দিন পরেই আমার বিবাহ। একেবারে যদি কোন আপত্তি না করি, তাহা হইলে মায়েরাই বা কি মনে করিবেন, এজন্য এবারেও কিঞ্চিৎ নরমভাবে আপত্তি করিলাম। কিন্তু সে আপত্তি যে কিছুই নহে, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না।

পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল, বিবাহের দিনও আসিয়া উপস্থিত হইল। রামদুলালবাবু পূর্ব্বেই কলিকাতায় একখানি বাটী ভাড়া করিয়াছিলেন। তাঁহারাও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ হইয়া গেল। শুভদৃষ্টির পূর্ব্বক্ষণ-পর্য্যন্ত ভয় হইতেছিল—"যদি এ অমিয়া না হয়, তাহা হইলে কি হইবে?" কিন্তু শুভ-দৃষ্টির সময় সে-সন্দেহ দূর হইল। সম্মুখে দেখিলাম, অমিয়ার সেই পরিচিত লজ্জানম্র মুখখানি যেন আমার হৃদয়ের ভিতর হইতে মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ফুলশয্যার দিন সন্ধ্যার সময় অমিয়াকে বলিলাম, "দেখ অমিয়া, এখন থেকে তোমাকে আর 'আপনি' বলিব না, 'তুমি' বলিব।" এ কথার উত্তর অমিয়া কিছুই দিল না। সেই মুহূর্ত্তে পরেশ আসিয়া উপস্থিত। পরেশকে দেখিয়া অমিয়া পলাইবার আয়োজন করিতেছিল। তাহাকে বাধা দিয়া পরেশ বলিল, "দেখুন, বৌ-ঠান, আপনাকে একটা কথা বলি। এই যে সতীশ-ছোক্‌রাকে দেখ্‌তেছেন, ইঁনি—আমি উহার আপনার সহিত বিবাহের আয়োজন করিয়া দিয়াছি বলিয়া—চিরকালের জন্য আমার মুখ দেখিবেন না, সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহা কি আপনি অনুমোদন করেন?" অমিয়া পরেশকে কোন উত্তর দিল না। আমার একবার মনে হইল, যেন সে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। আমি বলিলাম, "দেখ পরেশ, ও-কথার আলোচনা করিয়া আর বৃথা কেন কষ্ট পাও?" পরে অমিয়ার হাত ধরিয়া আমি বলিলাম, "অমিয়া! আমি যে তোমাকে ফিরিয়া পাইয়াছি, পরেশই তাহার একমাত্র কারণ; সুতরাং আমাদের উভয়েরই উহার নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।" পরেশ বলিল, "তোমরা পরস্পরের নিকট এখন কৃতজ্ঞতা কিংবা আরও কোন উচ্চ অঙ্গের ভাব প্রকাশ করিতে থাক। আমি আমার অনধিকার প্রবেশের জন্য ক্ষমা চাহিয়া চলিলাম!" এই বলিয়া সে অমিয়ার হাতে একটি কৌটা দিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। পরেশ চলিয়া যাইলে কৌটাটী খুলিয়া দেখিলাম তাহাতে দুইটী আংটী রহিয়াছে। একটীতে অমিয়ার নাম লেখা, ও অপরটীতে আমার নাম লেখা।

ক্রীড়াপুত্তলী।

'আমার' 'আমার' করি' ভাবে শুধু মূঢ় মন,
কিন্তু হায়! কোথায় আমার!
ক্রীড়ার পুতুল তব আমার হৃদয় ল'য়ে
লীলাময়! খেল অনিবার!

কখনও শিশুর মত সাজাইয়া রাখ তারে
আপনার চরণের তলে,
কখনও পিশাচ-বেশ পরাইয়া রাখ দূরে,
যেন অতি-অনাদর-ছলে!

কখনও রাখহ তারে পবিত্র আসনে তব
কুসুমের কোমলতা দিয়া,
নির্ম্মম পাষাণে বাঁধি' কখনও বা তারে যেন
অবজ্ঞায় দাও সরাইয়া!

আপনার জ্যোতিঃ দিয়া কভু বা স্নেহের ভরে
বিমণ্ডিত কর তুমি তায়;
আবার কালিমা ঘন মাখাইয়া কর দূর
না রহিতে তব সীমানায়!

কভু বা লীলার ছলে উড়াইয়া দাও তারে
অতি উর্দ্ধ আকাশের পানে,
হের উচ্চে উঠি' কিবা তোমারে ভুলিতে চায়,
মত্ত হ'য় আপনার জ্ঞানে!

আপন মোহের বশে আপনি চলিতে যায়
তোমার শকতি ফেলি' দূরে,
কিন্তু তোমা' ছাড়ি' সে যে হারা'য়ে আপন বল
নেমে পড়ে কোন্ নিম্নপুরে!

সেথা দেখে অন্ধকার—শুধু ঘোর অন্ধকার।
অসহায় নাহি আলম্বন!
শান্তি-হারা রুদ্ধশ্বাসে লুটিয়া লুটিয়া কাঁদি'
স্মরে পুনঃ তোমার চরণ।

তুমিও কৌতুক-ভরে পুতুলের রঙ্গ দেখি'
তুল তারে হ'তে নিম্নস্তর;—
যেন সকরুণ প্রাণে তাহার বেদনা বুঝি'
আপনার বুকের উপর।

ক্রীড়ার পুতুল তব এ জড় হৃদয় মম
তোমার শকতি ল'য়ে চলে,
খেলাও, সে খেলে তাই, তবুও কি ভ্রান্তি-বশে
'আমার' 'আমার' শুধু বলে!

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

ভারতীয় সঙ্গীত।

সঙ্গীত মানব-জাতির পরম আদরের সামগ্রী। পৃথিবীর সুসভ্য অসভ্য সর্ব্ব-জাতির মধ্যেই সঙ্গীতের সমাদর পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর আদিম অবস্থা হইতে বর্ত্তমান কালের ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক দেশে—কি ভারতভূমে, কি মিশরে, কি গ্রীসে—কি রোমে, সর্ব্বত্রেই সঙ্গীত অতিশয় উচ্চ আসন পাইয়াছে। শুধু তাহাই নয় যখন কোন বিজ্ঞান, পুরাণ, দর্শন, শিল্প বা গণিত, কিছুই মানুষের মস্তিকে উদ্ভূত হয় নাই, তখন বা তাহারও বহু পূর্ব্ব হইতে সঙ্গীত মানব-জাতির হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। কেন না, সঙ্গীত মানবের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি; তাহার প্রকৃতির অন্যতম উপাদান। এইজন্য স্বভাবতই উহা তাহার মধ্যে বিকসিত হইয়া উঠিবে।

মনোভাব প্রকাশে বা তাহার পরস্পর আদান-প্রদানের উপায়ভূত ভাষা-সৃষ্টির বহু পূর্ব্বে সঙ্গীত জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শিশু প্রথম ভূমিষ্ঠ হইয়াই যে রোদন করিয়া থাকে, উহাও সঙ্গীতের এক রূপ। তাহার রোদন, অস্ফুট ভাষণ, হসন, চলন, সমস্তই একই সঙ্গীতের বিভিন্ন বিকাশমাত্র। মানুষের ভাষা এই অনন্ত সঙ্গীতের এক আকার-ভেদমাত্র। কিন্তু সঙ্গীত মানুষের প্রকৃতিগত বৃত্তি হইলেও সমস্ত দেশে, সমস্ত জাতির মধ্যে ইহা সমানভাবে বিকাশ লাভ করে নাই। পাত্রভেদে ইহা নানাস্থানে নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতবর্ষে

এই সঙ্গীত-বিদ্যা কি মূর্ত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

অতিপ্রাচীন কাল হইতে হিন্দুজাতি সঙ্গীত-বিদ্যা অতিযত্নের সহিত অনুশীলন করিয়া আসিতেছেন। বস্তুতঃ ভারতে সঙ্গীত-বিদ্যা এতই প্রাচীন যে কোনও ব্যক্তি-বিশেষ ইহার প্রবর্ত্তক না থাকায় ইহাকে দেবতা-সম্ভূত বলিয়া মনে করা হয়।—মানবের আদিগান সামগান এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে প্রথম গীত হয়। হিন্দুমাত্রেই বেদকে নিত্য ও অপৌরুষেয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং সঙ্গীত-বিদ্যাকেও হিন্দুরা দেবসম্ভূত ও অনন্ত বলিয়া বিবেচনা করেন।

সঙ্গীত-কলার উৎপত্তি-বিষয়ে আমাদের দেশে কতকগুলি পৌরাণিক আখ্যায়িকার প্রচলন আছে। সেগুলি সকলে সমান ভাবে বিশ্বাস করিতে না পারিলেও হিন্দু-সঙ্গীতের উৎকর্ষ-সম্বন্ধে অনেক মনীষীরই মতের ঐক্য দেখা যায়। দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত ঐকান্তিক সাধনার ফলে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হওয়ায়, ইহা মানুষেরই সাধন-লব্ধ ধন বলিয়া সহজে প্রত্যয় হয় না।

যাহা হউক, ভারতীয় সঙ্গীতের উদ্ভব নর-লোক বা দেবলোক যাহা হইতেই হউক, ইহা যে এক অতুলনীয় অমূল্য সম্পদ, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই সঙ্গীতে হিন্দু-সভ্যতার আকৃতি, প্রকৃতি ও বিশেষত্ব অতি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধির সূক্ষ্মগ্রাহিতা, বিস্তার, ব্যাপকতা ও উদারতা এবং ভাবের আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি যে সমুদয় গুণাবলি তাহার সভ্যতাকে এত মহিম-মণ্ডিত করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই এই সঙ্গীত-চর্চ্চায় সবিশেষরূপে অভিব্যক্ত।

প্রথমতঃ হিন্দু স্বর বা নাদকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন। তাহার শাস্ত্র, তাহার দর্শন তাহাকে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে। ব্রহ্মই যদি জগৎ-কারণ হন্, আর সেই জগৎ-কারণ যদি স্বরাত্মক হয়, তাহা হইলে স্বর বা সঙ্গীতই জগৎ-কারণ। কারণের গুণ কার্য্যে বর্ত্তিয়া থাকে। সুতরাং এই সৃষ্ট প্রকৃতিও সঙ্গীতময়। ব্রহ্ম যেমন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, নির্গুণ, নির্ব্বিকার, নিত্য-শুদ্ধ-মুক্তস্বভাব সঙ্গীতও তদ্রূপ; কেন না, উভয়ই এক,—অভিন্ন। কেবল সঙ্গীতে "রসো বৈ সঃ" অনন্ত মাধুর্য্যময় রসরূপী ব্রহ্মের নিবিড় আনন্দ-রসের অনুধাবন ও আস্বাদন। এই অনন্ত অফুরন্ত মধু-সিন্ধুর বিন্দুমাত্র উপভোগেই চরাচরের চরম ও পরম লাভ। তাই উপনিষদ্ বলিতেছেন—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্ত্যানন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" অর্থাৎ আনন্দ হইতেই ভূত-সকল জন্মিতেছে, আনন্দের দ্বারাই জীবিত থাকিতেছে এবং অন্তিম-কালেও আনন্দেতেই প্রবিষ্ট বা লীন হইতেছে।

একমাত্র ভারতবর্ষে ব্যতীত কুত্রাপি সঙ্গীতের এত উন্নত উদার কল্পনা সম্ভব হয় নাই। এই জন্যই সাধক বলিয়াছেন—'গানাৎ পরতরং নহি'। পক্ষান্তরে সঙ্গীতরস-রসিক পাশ্চাত্ত্য কবি বলিলেন, "Eloquence the Soul, Song charms the sense." এই দুইটি সম্পূর্ণ-বিরুদ্ধ-ভাব-বিশিষ্ট উক্তি হইতেই দুইটি জাতির মানসিক প্রকৃতির যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। একজন আধ্যাত্মিকতার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে সমারূঢ়। তিনি সঙ্গীতে ভূমানন্দই

পাইয়া থাকেন ; আর একজন জড়বাদের নিম্ন স্তরে অবস্থিত। তিনি সঙ্গীতে ইন্দ্রিয়-সম্মোহনের অতিরিক্ত কিছুই প্রাপ্ত হ'ন না।

কেবল তাহাই নয়, কোনও পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত সঙ্গীত-কলাকে "সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প-বিরক্তিকর শব্দ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "Music is the best disagreeable of all noise." পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রকৃতি সঙ্গীতময়ী। প্রকৃতির অণের কার্য্যাবলী সেই অনন্ত সঙ্গীতের সুরলয়ে ঝঙ্কৃত ও নিয়ন্ত্রিত। পাশ্চাত্ত্য নরদেবতাগণের কেহ কেহ ইহার আভাস পাইলেও তাঁহারা উহা সম্পূর্ণ অনুভব করিতে সমর্থ হন নাই। তাই কেহ বলিলেন, 'There is not the smallest orb which thou beholdest but in its motion like an angel sings'. কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিলেন যে, যতক্ষণ আমাদের এই বিনাশশীল জড়দেহ থাকিবে, ততক্ষণ ইহার অনুভব সম্ভবপর নহে। অপর কবি বলিলেন যে, এই সঙ্গীত আমাদের সাধারণ স্থূল অসংস্কৃত শ্রবণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে (Gross unpured ears. এই অনন্ত অসীম অখণ্ড এক সঙ্গীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য রাগরাগিণীতে সীমাবদ্ধ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ও করিতেছে। তাই হিন্দু সঙ্গীতে ৬ রাগ ও ৩৬ রাগিণীর সৃষ্টি ও তাহাদের পরস্পরের সংযোগে ও সংমিশ্রণে অসংখ্য রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। এবং মিঞা তান সেন, বাইজু, বাহড়া, নানক প্রভৃতি সঙ্গীতের উপাধ্যায়গণ নানা প্রকার নূতন নূতন রূপের কল্পনা করিয়া নূতন নূতন রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছেন ; যথা দরবারী কানেড়া, পিলু, ইমন ইত্যাদি। প্রকৃতই হিন্দুগণ যে এই অসংখ্য মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া অসংখ্য রাগ রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের রসবত্তা ও সঙ্গীত-সাধনার পরাকাষ্ঠার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

অনন্ত অসীম বস্তু চিরকালই সীমা ও অন্তের গণ্ডির ভিতর আসিয়া পুনরায় অনন্তের ও অসীমের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই যে সান্ত ও অনন্ত, সসীম ও অসীমের অবিরত মিশামিশি, ইহা হইতেই যাবতীয় সৃষ্টিপর্য্যায় ; তাই কবি বলিয়াছেন—

'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চায় ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।'

এই কবিতাটিতে কবি প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। অসীম অনন্ত যেমন আপনাতেই আপনি পরিতৃপ্ত হইয়া আপনাকেই সীমার গণ্ডীর মধ্যে ধরা দিতে চায়, সান্ত ও সসীমও সেইরূপ নিজের গণ্ডী ছাড়িয়া অনন্ত ও অসীমের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

অখণ্ড অনন্ত গন্ধরাশি আপনাতেই আপনি তৃপ্ত নহে। তাই সে ধূপ ফুল ফল লতা পাতা প্রভৃতিতে আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া থাকে।

তাহা না হইলেই বা গন্ধের উপলব্ধি কি-প্রকারে সম্ভবপর হইত? যেই ধূপ পুড়িয়া ছাই হইল, ফুল-ফল লতা-পাতা শুকাইল, সীমার শিকল ভাঙ্গিয়া গেল, অমনি তাহার গন্ধও অনন্তের সহিত মিলাইয়া গেল। সুরের মধ্যেও সেই একই ক্রিয়া। অখণ্ড অনন্ত সঙ্গীত যদি নিজ-সত্তাতেই অবস্থিত থাকিত, তাহা হইলে কি তাহার সন্ধান পাওয়া সহজ হইত। তাই সে আপনিই অসংখ্য ছন্দের শৃঙ্খলে আপনাকে বাঁধিয়া অশেষপ্রকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কিন্তু প্রতিধূপে যেমন অনন্ত গন্ধের সন্ধান পাওয়া যায়, প্রতি-ছন্দোবদ্ধ সুরে বা রাগিণীতেও তেমনি সেই অনন্ত সুরের আভাস পাওয়া যায়।

রাগ-রাগিণীমাত্রই বিভিন্ন ভাবের অভি-ব্যক্তি। ভাবও অনন্ত বস্তু; নানাপ্রকার রূপ-পরিগ্রহতেই তাহার বিকাশ ও পরিণতি। ভাবকে মূর্ত্ত করিয়া এমন একটু কিছুর ছাপ তাহাতে দিতে হইবে, যাহাতে দিব্য ও অনন্তের ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। তাই কবি বলিয়াছেন,

"The light that never was on
sea or land
The consecration and the poet's
dream."

হিন্দু সঙ্গীতের রাগ-রাগিণী এই অনন্ত ভাব-রাশির রূপবিকাশ। এই রূপ-বিকাশে শিল্প-কলার সুনিপুণ নিয়োগ চাই, কেন না রাগ-রাগিণীকে এক অর্থে Artistic বা Aesthetic Idealisation বলিতে পারা যায়। কাব্যে যেরূপ ভাষা ভাবের অনুগামিনী, সঙ্গী-তেও সেইরূপ রাগাদি ভাবরূপের সহচর। ভাব যেখানে তরল, ভাষা ও সুরও সেখানে তরল; ভাব যেখানে গম্ভীর, ভাষা ও সুরও সেখানে গম্ভীর। তাই ভবভূতি যখন বলিলেন, মহৎ ব্যক্তির চরিত্র সহজে বোধগম্য হয় না, কখন ও উহা বজ্রের ন্যায় কঠোর কখনও বা কুসুমের ন্যায় কোমল, তখন ভাষাটিও সেই-রূপই করিলেন; যথা, "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" ইত্যাদি। সঙ্গীতেও সেই-রূপ তরল ভাব প্রকাশের জন্য ঠুংরি টপ্পা গানের সৃষ্টি; গুরু গম্ভীর ভাব প্রকাশের জন্য ধ্রুপদ ইত্যাদি গানের সৃষ্টি।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত মৈত্র।

পরশে।

তুমি নাথ, এসেছিলে
প্রথম প্রভাত গগনে;
তুমি নাথ, এসেছিলে
প্রখর দুপুর-তপনে!
তুমি এসেছিলে সখা
সাঁঝের সমীরে
ছড়ায়ে কুসুম-গন্ধ!

ফিরিয়া তোমারে, ওগো,
চাহি নাই আমি,—
ছিনু মোহ-ঘোরে অন্ধ!
মোর গর্ব্বিত মন
চাহে নি তোমায়,
দিয়াছে হেলায় ফিরায়ে;
শতবার মেলি

রয়েছ গো তুমি
বাঁধনে আমারে জড়ায়ে!
হৃদয় আমার
রুদ্ধ রয়েছে,
জ্ঞানের নাহিক লেশ!

তব, কোমল পরশে
জাগাও তাহে,
ঘুচে যাক্ সব ক্লেশ!

শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী।

আমাদের খাদ্য।

আমরা কি আহার করি এবং কেন আহার করি সে-বিষয় ভাবিবার কিংবা জানিবার অবসর আমাদের প্রায়ই হয় না। সাধারণতঃ ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই আহারের প্রয়োজন হয় এবং আহারের দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করি, ইহাই আমাদের ধারণা। উদর-সর্ব্বস্বদের মতে রসনা-তৃপ্তিকর নানাবিধ আহার্য্য আস্বাদনের জন্যই আমাদের জন্ম; কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের মতে জীবনধারণের জন্যই আহারের প্রয়োজন। আমরা আহার করিবার জন্যই জীবন ধারণ করি, অথবা জীবন-ধারণের জন্য আহার করি,—এই সমস্যার মীমাংসা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হওয়া সুকঠিন।

আমরা কি আহার করি, তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কেন আহার করি সে-বিষয় জানা আবশ্যক। আহারই শরীরের রক্ষা ও পুষ্টি-সাধনের একমাত্র উপায়, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু ইহা কি প্রকারে সাধিত হয়? শরীরের পুষ্টি-সাধন দুইভাবে হয়।—

প্রথম, শরীরের বৃদ্ধি ও তাহার ক্ষয়-পূরণের জন্য দৈহিক-যন্ত্র-গঠন-উপাদান-সমূহের পুষ্টি-সাধন (Tissue Bulding).

দ্বিতীয়তঃ, শরীর-যন্ত্র-চালনের জন্য (এঞ্জিনের কয়লার ন্যায়) শক্তিসঞ্চয় প্রয়োজন।

আমরা যাহা কিছু আহার করি, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য উপরি উক্ত দুইটী কার্য্যের সহায়তা করা। যদিও প্রত্যক্ষভাবে আমরা উপরি উক্ত উদ্দেশ্যে আহার করি না, কিন্তু পরোক্ষভাবে আহারের দ্বারা উপরি উক্ত উদ্দেশ্যগুলিই সাধিত হইয়া থাকে। ইহার একটী উদাহরণ এই যে, যখন আমরা সুস্থ-শরীরে থাকি, তখন যাহা অভিরুচি তাহাই আহার করি, কিন্তু শরীর অসুস্থ হইলেই চিকিৎসকের নিকট আহারের ব্যবস্থা লইতে হয়; অর্থাৎ তখন কোন্ যন্ত্রের পুষ্টির জন্য কিরূপ আহারের প্রয়োজন, তাহার নির্ণয় বৈজ্ঞানিক ব্যতীত অন্যের দ্বারা হওয়া অসম্ভব। উদর-সর্ব্বস্বেরা এই সময়েই আপনাদের ভুল বুঝিতে সমর্থ হন। বৈজ্ঞানিকেরা আহার ও আহার্য্য-সম্বন্ধে অনেক বহুমূল্য উপদেশ দিয়াছেন এবং তাঁহাদের উপদেশ-মত চলিলে কায়িক ও আর্থিক অনেক স্বচ্ছলতা হইতে পারে, কিন্তু আমরা তাহা করি না। যখন অপর্য্যাপ্ত আহার্য্য বস্তু পাওয়া যায়, তখন মিতব্যয়িতার কথা মনে থাকে না। তখন আমরা আহার্য্য বস্তুর

কত যে অপচয় করি, তাহার ইয়ত্তা থাকে না। অনেকে বলেন, কোন বস্তুরই অপচয় হয় না। যাহা পড়িয়া থাকে, তাহা পশু-পক্ষীতে আহার করে। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী এই ভীষণ যুদ্ধের পরিণামে ও বহুদেশে শস্যের উৎপত্তির অভাবে খাদ্য-দ্রব্যের দৌর্ম্মূল্য-হেতু সকল দেশেই অন্নকষ্ট ও দুর্ভিক্ষের হাহাকার উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে অনেকেরই মিতব্যয়িতার প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। যুদ্ধের সময় য়ুরোপীয় শক্তিপুঞ্জ কিরূপ মিতব্যয়িতার সহিত সুদীর্ঘ পাঁচবৎসর কাল আপনাদের আহারের সংস্থান করিয়াছেন, তাহা সকলেরই শিক্ষার বিষয়। মিতব্যয়িতাই ইহার প্রধান মন্ত্র। আহার্য্যের অপচয়-নিবারক বিভাগ (Food Control Dept.) মিতব্যয়িতার চরম উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। অপচয়-নিবারণের জন্য তাঁহারা বড় বড় বিজ্ঞাপনে নানাপ্রকার চিত্তাকর্ষক ছবির দ্বারা মিতব্যয়িতার মহামূল্য উপদেশ-সমূহ সকলের দৃষ্টিগোচর করিবার জন্য নানাস্থানে প্রচারিত করিয়াছেন। কাহারও গৃহের সম্মুখে এক টুক্রা রুটী পড়িয়া থাকিলেই তাহার উপর রীতিমত শাস্তির বিধান করা হইয়াছে; জীবন-ধারণের জন্য বিভিন্ন বয়সের স্ত্রীপুরুষের শরীর-পুষ্টির নিমিত্ত যে যে খাদ্যের যতটুকু প্রয়োজন তাহার পরিমাণ অনুসারে প্রত্যেকের আহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং এখনও সেই নিয়ম-অনুসারেই আহার-ব্যবস্থা চলিতেছে। এই সব স্থানে এখনও বিজ্ঞাপন দেখা যায়—"আহারের মিতব্যয়িতা-সম্বন্ধে তিনটী মহামূল্য উপদেশ :—যত্নের সহিত রন্ধন কর, ধীরে ধীরে আহার কর,—পুষ্টিকর কোনও দ্রব্যের অপচয় করিও না।" "The three golden rules for food-economy—Cook carefully, Eat slowly—Waste nothing nutritious".

আমাদের আহার্য্য-নিরূপণের জন্য রাসায়নিক বিশ্লেষণ (chemical analysis.) আমাদিগকে সবিশেষ সাহায্য করে। ইহার দ্বারা আমরা আমাদের খাদ্য-দ্রব্যের উপাদান ও তাহার কার্য্যকারিতা কি, তাহা জানিতে পারি। আমাদের আহার্য্য বস্তুর উপাদান-সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদানগুলিই প্রধান—

১। Protein (e. g. Gluten)—লালাজাতীয় দ্রব্য। ময়দার আটা-ভাগ, অর্থাৎ যে পদার্থ থাকাতে ময়দা ভিজাইলে আঁটাল হয়।

২। Albuminous (e. g. Gelatin) অণ্ডমধ্যস্থ শ্বেতাংশবিশেষ এবং উদ্ভিদ্‌ ও জৈব-দেহমধ্যস্থ তৎতুল্য পদার্থ।

৩। Carbohydrate (e. g. Sugar, starch)—চিনি, (মাড়), শ্বেতসার-জাতীয়।

৪। Fats (e. g. butter, oil etc)—তৈলাক্ত পদার্থ।

৫। Vitamins—খাদ্যের পচন-সাহায্যকারী পদার্থ। ইহার উপাদানগুলির তত্ত্ব এখনও সম্পূর্ণ জানা যায় নাই। ইহা পচনের সাহায্যকারী, কিন্তু খাদ্য প্রস্তুত করিবার সময় ইহা শীঘ্র নষ্ট হওয়া সম্ভবপর। খাদ্য-দ্রব্যে ইহারই অভাব বেরীবেরী-রোগের কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

৬। Mineral matters—খনিজ পদার্থ অর্থাৎ লবণজাতীয় দ্রব্য।

৭। Water—পানীয় জল।

উপরি উক্ত উপাদানসমূহের মধ্যে প্রথম চারিটী অর্থাৎ Protein, Albumin, carbohydrate ও fats শক্তি-সঞ্চারক (supply energy) এবং শেষের দুইটী অর্থাৎ mineral matters ও water শরীর-বৃদ্ধি ও ক্ষয়-পূরণের সাহায্যকারী (Tissue builders.)।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ-দ্বারা আমাদের খাদ্য-সামগ্রী-সমূহের কোন্‌টার দ্বারা উপরি উক্ত দুই কার্য্যের কতখানি সম্পাদিত হয়, তাহা জানা যায় এবং এই সকল পরিমাণকে খাদ্যের আহার্য্য-মূল্য (Food value), পুষ্টিসাধন-ক্ষমতা (Building power) ও শক্তিকারক পরিমাণ (energy value) বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হয়। উপরি উক্ত উপাদানের যে কোন দ্রব্যের একগ্রাম (one gram) পরিমাণ দগ্ধ করিলে যতটী উত্তাপ পাওয়া যায়, সেই উত্তাপ-জনক ক্ষমতাকে calorific value বলা হয়।

পারিমাণিক খাদ্য-নির্দ্ধারণের জন্য কিংবা আহার্য্য-দ্রব্যের গুণানুসারে আহার্য্য ব্যবস্থার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।—

১। আমরা যে পরিমাণ খাদ্য আহার করি তাহার সমস্তটা শরীরের ব্যবহারে আসে না; এবং শরীরেরই বা কোন্ অংশের আংশিক অসম্পূর্ণতা-পরিপূরণের জন্য ইহা ব্যবহার হইতে পারে।

২। খাদ্যের পরিপূরণশক্তি খাদ্যদ্রব্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন। তৈলাক্ত খাদ্যসমূহের পরিপূরণ শক্তি অধিক।

৩। পচন ক্রিয়ার সময় (পরিপাকের সময়) আহার্য্যের উপাদানগুলির যতটী শরীরে শোষিত হয়, সেই অনুসারে আহার্য্য-দ্রব্যের বিভিন্নতা নির্দ্ধারিত হয়।

৪। ব্যক্তিগত খাদ্যে রুচি, হজমশক্তি, বয়স, জাতি ও শরীর অনুসারে খাদ্য-দ্রব্যের বিভিন্নতা নির্দ্ধারিত হয়।

আহার্য্য-ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য দুইটী। প্রথম, সকল প্রকার অপচয়-নিবারণ; যথা— ভাণ্ডারজাত আহার্য্য দ্রব্য, রন্ধন ও প্রস্তুতকরণ, প্রত্যেক ব্যক্তির আহার্য্য-পরিমাণ এবং অনাবশ্যক আহার—এই সকলে অপচয়-নিবারণ।

দ্বিতীয়তঃ—সাম্য-আহার অর্থাৎ যাহাতে শরীর-বর্দ্ধনকারী আবশ্যক সকল দ্রব্যগুলিই বর্ত্তমান থাকে, প্রত্যেকেরই এইরূপ মিশ্রিত আহারের প্রয়োজন (mixed diet)। সাধারণতঃ দৈনিক আহারে লালাজাতীয় (Protein) ১২ ভাগ, শ্বেতসার (starch) ৫০ ভাগ, তৈলাক্ত পদার্থ (fats) ৫ ভাগ ও অবশিষ্ট খনিজ ও জলীয় পদার্থ আবশ্যক।

খাদ্যের লালাজাতীয় (Protein) উপাদানই প্রধানতঃ শরীরবর্দ্ধক; খনিজ ও জলীয় উপাদান তাহাকে সাহায্য করে। শ্বেতসার ও তৈলাক্ত খাদ্য প্রধানতঃ শক্তি-সঞ্চারক, কিন্তু সকল উপাদানই প্রত্যেককে সাহায্য করে।

দৈনিক খাদ্যের আবশ্যক পরিমাণ।

(লালাজাতীয়)—৪ $\frac{১}{৪}$ আউন্স } উত্তাপজনক শক্তি
(চিনিজাতীয়)—১৭ $\frac{১}{২}$ " } ৩০০০ calorie

এক্ষণে আমাদের প্রধান খাদ্য-দ্রব্যগুলির উপকরণ ও শক্তিপরিমাণ দেখা যাক্। আমরা সাধারণতঃ আমাদের খাদ্য দুইভাগে বিভক্ত

করিয়া থাকি—নিরামিষ ও আমিষ। আমাদের দেশে নিরামিষ খাদ্যবস্তুর সংখ্যাই অধিক এবং তাহার মধ্যে চাউল, গম, ভুট্টা, জই, যব, আলু, শাক্-সব্জী, ফল, চা, চিনি ইত্যাদিই প্রধান। আমিষের মধ্যে মৎস্য, মাংস, ডিম্ব ইত্যাদি। ইংরাজি মতে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যসমূহ আমিষের (animal food) মধ্যে গণ্য, কিন্তু ডিম্বকে অনেক সময় নিরামিষের মধ্যে ধরা হয়। আমাদের জীবন-ধারণের প্রধান প্রধান দ্রব্যগুলির গুণাগুণ নিম্নে বর্ণিত হইল।—

চাউল।—ভাতই আমাদের দেশে প্রধান খাদ্য। ইহাতে উদ্ভিদ্-শ্বেতসার (শুষ্কমাড় starch) শতকরা ৭৩ ভাগ, কিন্তু অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যের পরিমাণ কম। শ্বেতসারের ভাগ অধিক পরিমাণে থাকায় ইহার খুব ধীরে ধীরে পরিপাক হয় এবং অন্ত্র-পথে (alimentary canal) গতির সময় ইহার সমস্তই প্রায় শরীরে শোষিত হয়। সেইজন্য ইহা একটী অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। ইহাকে জলে সিদ্ধ করিয়া রন্ধন করার পরিবর্ত্তে বাষ্পে সিদ্ধ করাই বিধেয়। কারণ, জলে সিদ্ধ করায় ইহার কতক পরিমাণ সারাংশ অতিরিক্ত জলের সহিত বাহির হইয়া যায়। ৺ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিকের আবিষ্কৃত Icmic যন্ত্রের রন্ধন-প্রণালীতে বাষ্পদ্বারা সমস্ত রন্ধন কার্য্য সম্পাদিত হয়। (ক্রমশঃ)

মেয়েদের কথা।

১। নারীর কৃতিত্ব।—ক্যানেডা রাজ্যের অন্তর্গত কলম্বিয়া-প্রদেশ হইতে মিসেস্ মেরি এলেন স্মিথ নামে এক মহিলা তথাকার মন্ত্রি-সভায় স্থান পাইয়া নারীজাতির গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন। সমগ্র ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মধ্যে তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন রমণী এত বড় উচ্চ পদ লাভ করিতে পারেন নাই। চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি ভ্যাঙ্কুভার-নগরের প্রতিনিধি হইয়া ব্যবস্থাপক সমিতির সভ্য হয়েন। সেই বৎসরেই তাঁহার স্বামী কোষাধ্যক্ষ রাল্‌ফ স্মিথের মৃত্যু হয়। তখন বহু জনের সম্মতিক্রমে তাঁহার পত্নী এলেন স্মিথকেই তাঁহার স্থানে নিযুক্ত করা হয়। ক্যানেডার ইতিহাসে পার্লামেণ্ট সভায় স্ত্রীলোক নির্ব্বাচিত হইলেন এই প্রথম, তা'ও আবার স্বামীর পরিবর্ত্তে।

পরবর্ত্তী তিন বৎসরের মধ্যে তিনি দুইবার নির্ব্বাচনে উঠিয়াছিলেন ;—শেষের বার তাঁহার দিকে এত লোকে ভোট দিয়াছিল যে, এক-দিকে অত ভোট ক্যানেডার প্রাদেশিক ইতিহাসে আর কখন হয় নাই। কিছুদিন পরেই কলম্বিয়ার পার্লামেণ্ট-সভায় তাঁহাকে সভাপতি নিযুক্ত করা হয় ; ব্রিটিস সাম্রাজ্যে আর কখনও এরূপ গুরুত্বব্যঞ্জক পদ কোন স্ত্রীলোকের উপর অর্পিত হয় নাই। কিন্তু সভাধিবেশনের কিছু পূর্ব্বে তিনি এ-প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন ; কারণ, তাহাতে তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটিত। এক-মাসকাল পরে তিনি মন্ত্রিসভায় সভ্য নিরূপিত হইলেন। সভ্য হইয়া তিনি স্ত্রীলোকদের জন্য কয়েকটী সুবিধাজনক

আইন পাশ করান। দুঃস্থ জননীদের জন্য সরকারী বৃত্তির বন্দোবস্ত করেন। যে-সকল নারী বিলাতে বাস করিবার স্থান পায় না, তাহাদিগকে ক্যানেডাতে আনাইয়া যাহাতে যথোপযুক্ত স্থানে বাস করিতে দেওয়া হয়, এই উদ্দেশ্যে ক্যানেডাতে একটী সমিতি আছে। এলেন স্মিথ তাহারও একজন সভ্য।

তাহার তিনটী সন্তান। তিনি খুব সাদাসিদে জিনিষের পক্ষপাতী। ব্রিটিশ কলম্বিয়ার সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিয়া "আমাদের মেরি এলেন" বলিয়া জানে।

২। স্ত্রী-পুরুষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা (সাময়িক পত্র হইতে সঙ্কলিত)।—ইয়োরোপে আজকাল স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব দেখা যাইতেছে, সেটা নাকি পৃথিবীর অসভ্য জাতিদের মধ্যে খুব প্রবল। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আদিম মানব তাহার সমাজকে সুশৃঙ্খল করিবার জন্য এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে-সকল নিষেধ-বিধির প্রচার করিয়াছিল, আজও কোথাও কোথাও সেই সকল বিধি লঙ্ঘন করিলে নরনারীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এই যে পরস্পরকে দূরে রাখিবার স্বাভাবিক ভাব, ইহার সৃষ্টির প্রধান কারণ বোধ হয়, স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষদের ঈর্ষ্যা ও তাহাদের উপর অবাধ কর্ত্তৃত্ব করিবার অভিলাষ। দেখা যায়, কোন কোন বর্ব্বর জাতির স্ত্রীরা পুরুষদের এই প্রভুত্ব হইতে দূরে থাকিতে চাহিয়া তাহাদের নিজেদের আমোদ-প্রমোদের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল গঠিত করিয়াছে। এ বিষয়ে পরস্পরের সম্বন্ধে যে প্রবেশ-নিষেধ আছে, তাহা অমান্য করিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। দক্ষিণ আফ্রিকার বেচুয়ানাদের মধ্যে একটা নিয়ম আছে যে, তাহাদের মাঠে লাঙ্গল দিবে কেবল পুরুষেরা; কোন স্ত্রীলোক এমন কি গোরু বাছুর স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পাইবে না। গ্রীণলণ্ডের এস্কিমোজাতির মধ্যে পুরুষ স্ত্রীর কার্য্যে কিংবা স্ত্রী পুরুষের কার্য্যে কোন প্রকার সহায়তা করিলে তাহা একান্ত গর্হিত ও নিন্দনীয় বলিয়া মনে করা হয়। বোর্নিয়োদ্বীপের আদিম অধিবাসিগণের বালকদিগের পক্ষে হরিণের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। কারণ, উহা বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকদের খাদ্য। বালকরা সে খাদ্য খাইলে হরিণের মত ভীরুস্বভাব হইয়া পড়িবে, এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস।

স্ত্রীপুরুষের মধ্যে পার্থক্যবোধ অনেক সময় এত অধিকমাত্রায় পৌঁছিয়াছে যে, স্ত্রীজাতি ও পুরুষ-জাতির জন্য দুইটী বিভিন্ন ভাষার পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইয়াছে। মধ্য আমেরিকায় ও দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর ভাগে ক্যারিব-নামে এক বন্যজাতির নিবাস আছে। তাহাদের পুরুষের সহিত কথা বলিতে হইলে একরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে হয়;—সে কথা পুরুষে পুরুষেই হউক আর স্ত্রীতে পুরুষেতেই হউক তাহাতে ক্ষতি নাই।—আবার স্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলিতে হইলে স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহার করে; পুরুষেরাও যখন কোন স্ত্রীর কথার পুনরুক্তি করে, তখন স্ত্রীদের সেই ভাষাই ব্যবহার করে। আমাদের দেশেও স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে ভাষা-ভেদ দেখা যায়। সংস্কৃত নাটকাদিতে নারীগণের পক্ষে শৌরসেনী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষাই বিহিত হইয়াছে; সংস্কৃত-ভাষা তাহাদের সকলের উপযোগী নহে।

নরনারীর এই পরস্পরকে দূরীকরণের

ইচ্ছা তাহাদিগের আহারেও দেখা যায়। বিবাহ হইলে নরনারী পরস্পর সংযুক্ত হয় এবং তাহাদের পরস্পরের গণ্ডিকে অতিক্রম করে; এজন্য বিবাহোৎসবে স্বামী-স্ত্রী তাহাদের জীবনে একটীবার মাত্র এক সঙ্গে আহার করে। কোন কোন দেশে বিবাহের সময় স্বামী-স্ত্রীতে পরস্পরের বস্ত্র পরিবর্ত্তন করে, কখন বা পরস্পরের রক্ত-পান করে অথবা পরস্পর পরস্পরের রক্তে 'টীকা' দেয়। তাহাদের এই ধারণা যে, এরূপ অনুষ্ঠান স্বামী-স্ত্রীর প্রভেদ লুপ্ত করিয়া দিবে ও স্বতঃই তাহাদের অন্ত-র্মিলনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে।

৩। মহিলা ভ্রমণকারিণী।—মিসেস্ রোজিটা ফরবেশ-নাম্নী একজন ইংরাজ-মহিলা সম্প্রতি উত্তর-আফ্রিকার মরুভূমির ভিতর দিয়া ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তঁহার পূর্ব্বে কোন শ্বেতকায় মহিলাই এই স্থান দর্শন করেন নাই এবং প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে একজন জার্ম্মাণ পরিব্রাজক এই স্থানে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মিসেস্ ফরবেস এই সমস্ত স্থান ভ্রমণ করিয়া সেখানকার রাজনৈতিক ও ভৌগ-লিক অবস্থা এবং বাণিজ্যের সুবিধা অসুবিধা সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ইউ-রোপীয় ভ্রমণকারীদিগের মধ্যে একটী উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই ভ্রমণে তাঁহাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল; কয়েকবার ছদ্মবেশে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে হইয়াছিল। একবার তাঁহার জল ফুরাইয়া যায়; দুই-দিন অসহ্য জলকষ্টের পর তৃতীয় দিনে একটী কূপ আবিষ্কৃত হয় এবং তাহাতে তাঁহার ও তাঁহার অনুচরগণের প্রাণরক্ষা হয়। জ্বালানী কাষ্ঠের অভাব, পথপ্রদর্শকের পথ-ভ্রান্তি, অধিবাসিগণের শত্রুতা প্রভৃতি নানা বিপদে তাঁহাকে পড়িতে হইয়াছিল। একবার অসভ্যেরা তাঁহার তাঁবু আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে একটি ভোজ দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া সেই-দেশ দেখিবার অনুমতি লাভ করেন। মিসেস্ ফরবেস তাঁহার সহিত ক্যামেরা লইয়া গিয়া সেই দেশের অনেকগুলি ছবি তুলিয়া আনিয়াছেন। ছবি-গুলি সে দেশের লোকের অজ্ঞাতসারে তোলা হইয়াছিল, নচেৎ তাহারা বিপদ্ ঘটাইত। তিনি লণ্ডনে ফিরিবার পর সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী তাঁহাকে প্রাসাদে আহ্বান করেন এবং তিনিও তাঁহার ভ্রমণ-যাত্রার সমস্ত বিবরণ দেন। এই নারী একটা অসমসাহসিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া নারীজাতির অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

৪। কর্ম্মক্ষেত্রে নারীজাতি।—আজ-কাল অনেক দেশেই স্ত্রীলোকেরা তাঁহা-দের নানাবিধ কর্ম্মক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় দিতেছেন। মিসেস্ লিলিগর্ডন নামে এক মার্কিন মহিলা আমেরিকার যুক্তরাজ্যে মেন-প্রদেশে মেন-নদীতে ডুবুরীর কাজ করেন। অন্যান্য ডুবরীদিগের অপেক্ষা তাঁহার সাহস ও নৈপুণ্য কিছুমাত্র কম নহে। ঐ রাজ্যের উটা-প্রদেশে মিস্ কেরার ক্যাণ্ডসন কেরাণীপদ ছাড়িয়া ডেপুটি শেরিফের (সহকারী দণ্ডনায়ক) কাজ করিতেছেন; তাহাতে তাঁহাকে ফাঁসি দিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়, ডাকাত ধরিবার জন্য তাহাদের আবাসস্থানে গিয়া অনুসন্ধান করিতে হয়, এবং এইরূপ অনেক নারীস্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ করিতে হয়। মণ্টোনায় এক সুন্দরী রমণী মিস্ টাইলার ঘোড়-দৌড়ে

সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। অরিগন্ প্রদেশে রোজ সার্জ্জন নামে এক রূপসী বালিকা প্রত্যহ একটী অতিশয় বন্য ও নির্জ্জন স্থানের ভিতর দিয়া মাল গাড়ী চালাইয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ কলনীতে এক দল সন্যাসিনী আছেন। তাঁহারা মঠের সমস্ত কাজ ত করেনই, তাহা ছাড়া মাঠে লাঙ্গল দেওয়া হইতে গরুর দুধ দোহা, ঘোড়ার খুরে 'নাল' বসান, সকল কাজই করিয়া থাকেন। জাপানে নিয়াইগাটা-সহরে পঞ্চাশ হইতে একশত জন স্ত্রীলোক এবং ততগুলি পুরুষ প্রত্যহ সেই বন্দরের জাহাজে কয়লা সরবরাহ করে। সুইডেনের দেশোয় একদল স্ত্রীলোক আছে; সমগ্র ইয়োরোপের মধ্যে তাহাদের মত দমকল চালাইতে দক্ষ ব্যক্তি খুব কমই আছে। স্ত্রীলোক যে শাসনকর্ত্তার কাজও করিতে পারেন, কিছু দিন পূর্ব্বে মার্কিন-রাজ্যের অন্তর্গত নিউজার্সির শাসনকর্ত্তার অনুপস্থিতিতে তাঁহার সেক্রেটারী মিস্ ক্যাথিস জিন অতিদক্ষতার সহিত তাঁহার কার্য্য পরিচালনা করিয়া তাহা স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। মিসেস্ এনা ক্লিন রিকার্ট নামে এক কপর্দ্দকশূন্য বিধবা অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়া স্বর্ণের সন্ধানে বাহির হয়েন। তিনি এরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন যে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই ছয়টা বৃহৎ খনি হইতে প্রভূত আয় করিতেছেন। মিস্ হিণ্টন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদ ছাড়িয়া দিয়া যেখানে স্বর্ণ পাওয়া যায়, এমন স্থলে ভাগ্য-পরীক্ষা করিতে গিয়া এখন তাহার পুরস্কারস্বরূপ একলক্ষ পাউণ্ডের অধিপতি হইয়াছেন। মিসেস্ এলারজ্ রিডার মার্কিন-দেশে একটি খবরের কাগজের অফিসে খামে ঠিকানা লিখিতেন। তাঁহার মাহিনা ছিল দৈনিক ১ ডলার (প্রায় ৪।০)। টাকা-কড়ির হিসাব-ব্যাপারে তিনি পুরুষ-পণ্ডিতদের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমেরিকার টাকার ব্যাপারে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা। মিসেস্ হেটি গ্রীণ বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা উপায় করিতেছেন; তাঁহার বয়স ৭০ অতিক্রম করিয়াছে। মিসেস্ রিচার্ড কিংএর পশুশালায় লক্ষ লক্ষ পশু আছে। তিনি তাহার কাজ পরিচালনা করিতেছেন। পশুশালাটি এত বড় যে তাহা ইংলণ্ডের একটি জেলার সমান হইবে।

কি আইন ব্যবসায়, কি বিচারকের কার্য্য, কি ধর্ম্মপ্রচার, কি দেশ-পরিভ্রমণ সকল বিষয়েই এখন পাশ্চাত্য জগতে নারীশক্তির বিকাশ দেখা যাইতেছে। এই জড়বাদিত্বের যুগে নারীজাতির অভ্যুদয়-সম্বন্ধে এই কয়টা সামান্য উদাহরণমাত্র দেওয়া গেল। ইহা ছাড়া আরও অনেক দিকে অনেক নারী তাঁহাদের শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আপনাদিগকে ধন্য ও জগৎকে মুগ্ধ করিতেছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শোকসংবাদ।—এক সময়ে যাঁহাদের অসীম যত্নে ও অযাচিত সাহায্যে বামাবোধিনীর জীবন দীপ নির্ব্বাপিত হইতে পারে নাই, সেই সকল দেবোপম-চরিত্র পরোপকারী নারীহিতৈষী

প্রাচীন শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণ একে একে ইহলোক হইতে অপসারিত হইতেছেন।

বামাবোধিনীর প্রবর্ত্তক ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের তিরোধানের পর যাঁহারা বামাবোধিনীর সম্পাদনের ভার লইয়াছিলেন, সিটী স্কুলের ভূতপূর্ব্বশিক্ষক ৺সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে একজন। ইনি কিছুকাল নিজের শত কার্য্যের মধ্যেও নিঃস্বার্থভাবে প্রাণপণ যত্নে ইহার সম্পাদনকার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন। বামাবোধিনীর এই পরম হিতকারী বন্ধু গত ২৫ আষাঢ় (৯ই জুলাই) বেলা ১২টার সময় তাঁহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই অকস্মাৎ তিরোধানে আমরা যারপরনাই ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অভ্যুত্থানে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলনের সময় সূর্য্যবাবু ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ইহাতে যোগদান করেন এবং সিটি স্কুলের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ স্কুলে শিক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করেন। ইঁহার

৺সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায়।

ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই এখন দেশের গণ্যমান্য কৃতি-সন্তানরূপে বিদ্যমান আছেন। দেশের বহু হিতকর কার্য্যের সহিত ইঁহার যোগ ছিল। ভগবান্ তাঁহার আত্মার চির-উন্নতি ও শান্তি-বিধান করুন এবং তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবার-পরিজনের প্রাণে সান্ত্বনা দান করুন।

নকল মুক্তা।—জাপানে একপ্রকার নকল মুক্তার আবিষ্কার হইয়াছে। ইহা দেখিতে ঠিক আসল মুক্তার মত। সুদক্ষ ব্যক্তি ভিন্ন কেহই ইহা নকল বলিয়া ধরিতে পারে না। এই মুক্তা মুক্তার বাজারে ঘোর আন্দোলন আনয়ন করিয়াছে।

উষ্ণ-প্রবাহ।—মার্কিণে এই বৎসর অত্যধিক গরম পড়িয়াছে। নিউইয়র্ক প্রভৃতি অনেক বড় বড় সহরে গরীব লোকেরা সমুদ্রোপকূলে অথবা উদ্যানে শুইয়া রাত কাটাইতেছে। অত্যধিক গরমে অনেক লোক পাগল হইয়া গিয়াছে। সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া অথবা ঘুমাইতে

গিয়া ছাদ হইতে পড়িয়া অনেকের মৃত্যু হইয়াছে।

যুক্তরাজ্যের ন্যায় ইউরোপেও অনেক স্থানে গরমে লোকের মৃত্যু হইয়াছে। লণ্ডনে আগুন লাগিয়া অনেক ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। ফ্রান্সেও এইরূপ অবস্থা; ইহার উপর আবার জলকষ্ট। জল না হওয়ায় সমস্ত শস্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। এক স্থানে এক বালতি জলের মূল্য নয় আনার অধিক হইয়াছে। দক্ষিণ ফ্রান্সে অত্যন্ত শিলাবৃষ্টি হওয়ায় তাহার ফলে সমস্ত শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বেলজিয়মেও অগ্নিকাণ্ড। বারুদের গুদামে আগুন লাগিয়া বিপদ্ ঘটিয়াছে। সর্ব্বত্রই জলাভাব। যাহাতে মেঘ হইতে বারিবর্ষণ হয়, সে-জন্য লোকে আকাশে হাউই ছুড়িতেছে।

ভারতীয় গুপ্ত পাণ্ডুলিপির পুনরুদ্ধার।—উপাদানের অভাব-বশতঃ ভারত ইতিহাসের পাঠকবর্গ স্বতঃই হতাশ হইয়া আসিতেছেন। ফলতঃ ভাবের প্রসার এবং চরিত্রের উৎকর্ষ সম্যগ্রূপে পরিস্ফুট হইতে পারে, এরূপ জাতীয় উপকরণের বিপুল আয়োজন তাহাদের নাই। তাঁহাদের সম্বল যে একেবারে ক্ষুদ্র, সে-বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পাণ্ডুলিপি ত দূরের কথা, মুদ্রিত কোন গ্রন্থ-সংগ্রহও নিতান্ত কষ্টসাধ্য। সুতরাং ভারত ইতিহাসের উন্নতি-কল্পে উপকরণ-সংগ্রহের বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল এবং বাঁকীপুরের খোদাবক্স লাইব্রেরী এই উদ্দেশ্যে পূর্ব্বেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারা যে সুযোগটুকু সম্মুখে ধরিতেছেন গবেষণাকারিগণ সেই সুবিধার সম্যক সদ্ব্যবহারের ত্রুটী করিতেছেন না। আধুনিক যে সকল অমূল্য গ্রন্থরাজি লিখিত হইতেছে, তাহাদের প্রায় অধিকাংশই এই সকল লাইব্রেরী এবং কতিপয় বে-সরকারী লাইব্রেরীর শুভ অনুষ্ঠানের ফল-প্রসূত। যিনি এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বে-সরকারী লাইব্রেরীর তিমির-গর্ভ হইতে লুপ্ত রত্নরাজি সংগ্রহ করিতে পারিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠতর পুরস্কারের প্রকৃত অধিকারী হইবেন। যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং বিহারের প্রায় অধিকাংশ জেলাই উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর আদিস্থান। এখনও এরূপ অনেক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎকার হয়, যাহাদের নিকট এইরূপ অমূল্য পাণ্ডুলিপি এবং মুদ্রিত গ্রন্থরাজি পাওয়া যাইতেছে। বড়ই সমস্যার বিষয় এই যে, এই লাইব্রেরীগুলি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত এবং এই সকলের স্বত্বাধিকারীর সাহায্য ব্যতিরেকে প্রকৃত প্রমাণ সংগ্রহ করা সুদূরপরাহত। যদি কোন পাঠক ভারত ইতিহাসের যে কোন অধ্যায়ের হিন্দুস্থানী, হিন্দী, পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী, ইংরেজী অথবা পারস্য ভাষায় লিখিত কোন পুরাতন পাণ্ডুলিপির স্বত্বাধিকারী হন, অথবা এইরূপ স্বত্বাধিকারীর সহিত পরিচিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি পত্র লিখিয়া ডক্টর্ এস্ এ খাঁ, এম্ এ, এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক-মহাশয়কে জানাইলে তিনি অত্যন্ত বাধিত হইবেন। তিনি মুদ্রিত পুস্তক অথবা পাণ্ডুলিপির জন্য উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত। যদি কেহ উহা হস্তান্তর করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে সেই পাণ্ডুলিপির অনুলিপি প্রস্তুত করিবার অনুমতির জন্য তাঁহাকে উপযুক্ত অর্থ প্রদান করা যাইবে।

I সা রা মা। রা মা মা। মা পা নর্সা। র্সা র্সা -া I
ন য় নে ন য় নে শু ধু চেয়ে থা কা ০

I র্সা র্রা র্সর্গা। পা ধা ধা। মা ধা মা। -ধণা র্সা -গর্সা II
অ ধ রে০০ অ ধ রে হা সা হা ০০ সি ০০

II র্সা র্সা ণা। া ধা পা। ণা ণা ধা। পা মা -রা I
জ্যো ছ না ০ মা খা ম ল য় স মী র্

I সা রা মা। -রা রা মা। মা -পা -ধা। ধা -া া I
ব হি বে ০ ধী রে ধী ০ ০ রে ০ ০

I না -া না। া র্সা র্সা। র্রা র্রা র্সা। া না র্সা I
কাঁ প্ বে ০ সু খে কু মু দী ০ বা লা

I মা -া -ধা। পা ধা পা। গা -পা -া। গা -মা া} I
নী ০ ল্ স র সী নী ০ ০ রে ০ ০

I মা মা পা। না না মা। র্সা -র্রা -া। নর্সা র্সা র্সা I
র জ ত ল হ রী প ০ ০ রে০ ক ত

I র্রা র্রা র্গা। র্রা র্সা র্রা। না -র্সা -র্রা। র্রা -া -া I
তা র কা প ড়ি বে ঝ ০ ০ রে ০ ০

I র্সা র্সা না। -র্সা ধা ণা। া পা -ধধা। ক্ষা পা পা I
মো রা দু ই জ নে ০ মু গ্ধ ন য় নে

I রা গা মা। পা ধা মা। মা ধা মা। -ধণা র্সা -নর্সা II II
চে য়ে র ব সু খে সা রা নি ০০ শি ০০

রমাবাই সরস্বতী।

"না জাগিলে সব ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।"

ভারতীয় রমণীদিগকে স্বর্গবিচ্যুত দেববালা বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। ধরাধামে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই তাহাদের অভীপ্সিত। তাই কোমলতা, স্নেহ, মমতা, আত্মত্যাগ ও পরসেবার উজ্জ্বল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহারা গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছেন। পরিবারভুক্ত লোকগণের সুখশান্তি-বিধানের জন্য তাঁহারা অহোরাত্র ব্যস্ত। ভাল ভাল আহার-সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া কিরূপে তাঁহারা পরিবারস্থ আত্মীয়-স্বজনের মনস্তুষ্টি বিধান করিবেন, রোগে সেবা-শুশ্রূষা করিয়া কিরূপে স্বজনের রোগ-যন্ত্রণার লাঘব করিবেন, শোকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া কি উপায়ে তাঁহারা শোক-সন্তপ্তচিত্তে শান্তিবারি সেচন করিবেন, বিপৎ-কালে মন্ত্রণা দিয়া কিরূপে তাঁহারা অস্থিরচিত্তে স্থৈর্য্যপ্রদান করিবেন—এই সকল চিন্তাই তাঁহাদের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া রাখে। নিজের কথা কখনও তাঁহারা ভাবেন না বা নিজের সুখ তাঁহারা কখনও অন্বেষণ করেন না। নিজের দুঃখ-কষ্টকে তাঁহারা কষ্ট বলিয়াই গ্রাহ্য করেন না। পরিবারস্থ সকলকে সুখে রাখিতে পারিলেই তাঁহারা অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন; পরসেবায় আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে পারিলেই তাহারা আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। ভারতীয় নারীর এই দুর্ল ভ চিত্র কোনও কোনও বৈদেশিক ও বিজাতীয় লোকের কামলাদোষদুষ্ট চক্ষে (Jaundice) হয় ত নিগ্রহ ও পীড়নের চিত্র বলিয়া অনুমিত হইবে। কিন্তু যাহারা ভারতের নারী-চরিত্র অভিনিবেশ-সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ভারতীয় নারীগণ পরসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিলে কিরূপ অভূতপূর্ব্ব আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র স্বীয় পরিবারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। তাহাদের স্নেহমমতা ও প্রেমরাজ্য শিক্ষাগুণে যে-দিন বিস্তৃত আকার ধারণ করিবে, সেদিন ভারতের ভাগ্যাকাশ নির্ম্মল ও মেঘনির্ম্মুক্ত হইবে। ভারতের নারীসমাজে পরসেবার যে নিঃস্বার্থভাব সুপ্ত রহিয়াছে,শিক্ষা-প্রভাবে তাহা জাগরিত হইলে জগতের যে কত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, তাহা অনুমেয় নহে। ভারতীয় নারী নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কত মঙ্গলসাধন করিতে পারে, তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী।

দাক্ষিণাত্যে মেঙ্গালোর জেলায় অনন্ত শাস্ত্রী নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। সংস্কৃত-ভাষায় তাঁহার অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি নিজে একজন শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ছিলেন; কিন্তু ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তিনি সর্ব্বদাই উদার মত পোষণ করিতেন। শাস্ত্রপাঠে স্ত্রীজাতির অধিকার নাই—এই অনুদার মতের পোষকতা তিনি কখনও করিতেন না। সুতরাং, তিনি নিজের পত্নী লক্ষ্মীবাইকে সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা দিয়া হিন্দু-শাস্ত্রের প্রবেশ-দ্বার তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দেন। তদীয় ধর্ম্মপিপাসু পত্নী নারীজাতি-সুলভ অধ্যবসায় ও একাগ্রতা-

বলে সংস্কৃত-শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান লাভ করেন।

এইরূপ শিক্ষিত মাতাপিতার গৃহে রমাবাই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁহার শিক্ষার ভার তাহার মাতার উপর অর্পিত হয়। মায়ের চরিত্রের প্রভাব কন্যার উপর সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তিয়াছিল। রমাবাই নিজমুখেই বলিয়াছেন যে, মায়ের স্নেহপূর্ণ সদুপদেশাবলীই তাহার ভবিষ্যজ্জীবনের আলোকস্বরূপ হইয়াছিল। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি মাতাপিতৃহীনা হন; কিন্তু এই অল্পবয়সের মধ্যেই স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিপ্রভাবে ও মাতাপিতার সুশিক্ষার গুণে তিনি সংস্কৃত-ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি আরও অনেকগুলি ভাষা শিখিয়াছিলেন। মরাঠী ত তাঁহার মাতৃভাষা ছিল। এতদ্ভিন্ন তিনি দেশ-ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে কানারী হিন্দুস্থানী ও বঙ্গভাষায় জ্ঞান অর্জ্জন করেন।

এতাবৎকাল তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন নাই। তিনি স্বীয় ভ্রাতার সহিত ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া নানাবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে তিনি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। এইখানে পণ্ডিতগণের সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ে তাহার নানাপ্রকার আলোচনা হয়। পণ্ডিতগণ তাঁহার অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞান ও অকাট্য যুক্তিবল দর্শন করিয়া বিস্মিত ও বিমোহিত হন, এবং তাহার গুণের উপযুক্ত পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে "সরস্বতী" উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু এখানে তাঁহার অদৃষ্টে এক দৈব দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহার একমাত্র ভ্রাতা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন্। তিনি এই অসহায় অবস্থায় বাধ্য হইয়া পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু বিবাহিত জীবনের সুখ বহুদিন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই, একটি কন্যা-সহ তাঁহাকে নিঃসহায় অবস্থায় রাখিয়া তাঁহার স্বামী পরলোক গমন করেন। রমাবাই শোকে দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং নিজের জীবন তাঁহার নিকট দুর্ব্বহ ভার-স্বরূপ প্রতীত হইতে লাগিল। কিন্তু এই দুঃখের মধ্যেও তিনি সুখের সন্ধান পাইলেন,—এই অশুভ ঘটনার মধ্যেও তিনি বিধাতার শুভ ইচ্ছা দেখিতে পাইলেন এবং স্বকীয় স্বার্থসুখে বিসর্জ্জন দিয়া পরার্থে আত্মনিয়োগ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। এই মহাসাধনায় আনন্দীবাই যোশী তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন এবং অর্থসাহায্য ও নানাপ্রকার উৎসাহবাক্যে তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

ভারতীয় স্ত্রীজাতির দুর্গতিদর্শনে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের দুর্দ্দশামোচন তিনি জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিলেন; স্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন—শিক্ষা ব্যতিরেকে তাহাদের উন্নতির আশা দুরাশামাত্র। হিন্দুসমাজের বাল্যবিবাহপ্রথা স্ত্রীজাতির শিক্ষার পথে প্রধান কণ্টক; সুতরাং, তিনি এই কণ্টকের উচ্ছেদসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তাই তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্নস্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা-দ্বারা জনসাধারণকে তাঁহার পক্ষসমর্থন করিবার জন্য কাতরপ্রাণে আহ্বান করিতে লাগিলেন। বোম্বাই-সহরের অধিবাসিগণ তাঁহার শুভকার্য্যে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইল এবং

তথায় আর্য্য-মহিলা-সমাজ নামে একটি সমাজ স্থাপিত হইল। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি-সাধন ও বাল্যবিবাহ-প্রথা-নিবারণ এই দুইটি তাহাদের মূলমন্ত্র হইল।

কিন্তু ভারতের সমাজ তখনও মৃতপ্রায়। সেই মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চার করা এক দুরূহ ব্যাপার। রমাবাই দেখিলেন যে, নিজ দেশ-বাসীর মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে, হয় ত, তাহার জীবন-ব্রত উত্থাপিত হইবে না,—হয় ত ইহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে, তাই তিনি সুসভ্য ও সমুন্নত ইংরাজ-জাতির শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার আরব্ধকার্য্যে উদারহৃদয় ইংরাজগণের সহায়তা-লাভের আশায়, তিনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংরাজি-ভাষা ইতঃপূর্ব্বেই তিনি কিছু কিছু জানিতেন। এখন তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া তিনি চেল্‌টেনহাম (Cheltenham) মহিলা কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ লাভ করিলেন। এই স্থানে তিনি বার বৎসর অবস্থান করেন, এবং নিজে ইংরাজি সাহিত্য, গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তাহার শুভানুষ্ঠানের প্রধান উৎসাহদাত্রী শ্রীমতী আনন্দবাই যোসী (Mrs Anandi bai Johsi) আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায় (Philadelpheia) চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তিনি রমা-বাইকে আমেরিকায় যাইতে অনুরোধ করেন। তাঁহার সাদর আহ্বানে রমাবাই ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় গমন করেন।

আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি সেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষভাবে আলোচনা করেন; কারণ, ভারতে স্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রকৃষ্ট পথ তিনি তখনও খুজিয়া পান নাই। তখন স্বনামধন্য জর্ম্মনশিক্ষা-সংস্কারক ফ্রোবেলের প্রবর্ত্তিত কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী আমেরিকায় প্রচলিত হইয়াছিল। এই শিক্ষাপ্রণালী রমাবাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহা ভারতীয় স্ত্রীজাতির পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া, তিনি এই শিক্ষাপ্রণালী বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি বলেন—'ফ্রোবেলের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে আমি লৌকিক (Secular) ও আধ্যাত্মিক (spiritual) শিক্ষার প্রকৃত সমাবেশ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ ফ্রোবেলের শিক্ষাপ্রণালীতে বালকের জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ পরিচালিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তাশক্তিরও উন্মেষ হয়। কাজেই এই শিক্ষাপ্রণালী-দ্বারা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ, সত্যই ফ্রোবেলের শিক্ষা প্রণালীর প্রাণ। সুতরাং, এই শিক্ষা-প্রণালী ভারতে অনুসৃত হইলে কুসংস্কারমূলক মোহান্ধকার হইতে ভারতসমাজ নির্ম্মুক্ত হইবে, এবং বন্ধনোন্মুক্ত হইয়া ভারতললনা স্বীয় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে।

তিনি আরও বলিতেন—"আমি ভারতের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মাতৃহৃদয় অধিকার করিতে বাসনা করি। সন্তানের মঙ্গলেচ্ছা মাতৃহৃদয়কে যেরূপ আকর্ষণ করে, পৃথিবীর অপর কিছুই ইহাকে সেইরূপভাবে আকর্ষণ করিতে পারে না। কিণ্ডারগার্টেন-শিক্ষাপ্রণালী যদি তাহাদের সম্মুখে যথোপযুক্তভাবে সমুপস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে, তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, সন্তানের ভবিষ্যৎ উন্নতি অনেকটা জননীর উপর নির্ভর করে। ভারতীয় রমণীগণ শিশুসন্তানগণের শিক্ষার জন্য বুদ্ধি-ও বিবেচনা-পূর্ব্বক যদি

উপযুক্ত পরিমাণে যত্ন গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহাদের সন্তানগণের অমঙ্গল সংঘটিত হইবে—এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, তাঁহাদের স্নেহপ্রবণ সন্তানবৎসল মাতৃহৃদয় স্বতঃই স্ত্রীজাতির শিক্ষার ও উন্নতির প্রতিবন্ধক দূর করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইবে।" রমাবাই এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির মধ্যে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালীর প্রচলন করিতে মনন করেন এবং কিণ্ডারগার্টেন-শিক্ষাপ্রণালী-সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে জ্ঞানলাভের জন্য তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষকদের এক ট্রেনিং স্কুলে ছাত্রীরূপে প্রবেশ করেন। তথাকার সুন্দর সুন্দর চিত্রসংবলিত, পুরু কাগজে বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত, শোভন মলাটযুক্ত শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মারাঠী ভাষায় শিশুদের জন্য ঐ প্রকার-পুস্তক প্রকাশ করিবার কল্পনায় তিনি আমেরিকার অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি সংগ্রহ করেন। এখন বঙ্গদেশে নানাপ্রকার বিচিত্র চিত্র বক্ষে ধারণ করিয়া, বহু পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। কোথাও বা চিত্রের সদ্ব্যবহার হইতেছে, আর কোথাও বা উহার অপব্যবহার হইতেছে। পণ্ডিতা রমাবাই প্রায় তিনযুগ পূর্ব্বে যে সত্যটি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, বাঙ্গালী এতদিন পরে সে সত্যটি কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

আমেরিকার ন্যায় স্বাধীন দেশের সংস্পর্শে আসিয়া এবং তথাকার স্ত্রীজাতির উন্নত অবস্থা দেখিয়া রমাবাইর স্থির বিশ্বাস জন্মিল যে, স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন করিতে না পারিলে ভারতের উন্নতি সুদূরপরাহত। তাই তিনি ঘৃণিত, অবহেলিত ভারতীয় বিধবাকুলের দুর্দ্দশামোচনে বদ্ধপরিকর হইলেন। অনাথা, আশ্রয়হীন বিধবাগণ আমাদের সমাজে কিরূপ দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করে, তাহাদিগকে গলগ্রহস্বরূপ মনে করিয়া আমাদের নিষ্ঠুর সমাজ তাহাদিগকে কিরূপ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা প্রদান করে, তাহা তিনি অবগত ছিলেন। উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া বিধবাগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিয়া নিগ্রহের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে, তিনি তাহার উপায়-নির্দ্ধারণে নিযুক্ত হইলেন।

অচিরকালমধ্যে তাঁহার কার্য্যপ্রণালী স্থির হইল। তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিধবাগণের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। বিধবাগণের দুঃখদুর্দ্দশামোচন তাহার জীবনের ব্রত হইল। ভারতে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আমেরিকায় অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। হিন্দু বালবিধবাদের দুঃখ নিবারণোদ্দেশ্যে আমেরিকায় বোষ্টন-নগরে 'রমাবাই'-সমিতি নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। সুসভ্য আমেরিকাবাসীর সহানুভূতিলাভ-প্রয়াসে রমাবাই 'উচ্চজাতীয় হিন্দুস্ত্রী' নামে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তাহাতে হিন্দুসমাজের বালবিধবাগণের জন্য কিরূপ কঠোর নিয়ম-সকল প্রবর্ত্তিত আছে, তাহা তিনি তাঁহার প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণন করেন।

ভারত সমাজে বিধবাকে কিরূপ হীনজীবন যাপন করিতে হয়, সমাজ তাহার উপর কিরূপ

তথায় আর্য্য-মহিলা-সমাজ নামে একটি সমাজ স্থাপিত হইল। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি-সাধন ও বাল্যবিবাহ-প্রথা-নিবারণ এই দুইটি তাহাদের মূলমন্ত্র হইল।

কিন্তু ভারতের সমাজ তথনও মৃতপ্রায়। সেই মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চার করা এক দুরূহ ব্যাপার। রমাবাই দেখিলেন যে, নিজ দেশ-বাসীর মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে, হয় ত, তাহার জীবন-ব্রত উত্থাপিত হইবে না,—হয় ত ইহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে, তাই তিনি সুসভ্য ও সমুন্নত ইংরাজ-জাতির শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার আরব্ধকার্য্যে উদারহৃদয় ইংরাজগণের সহায়তা-লাভের আশায়, তিনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংরাজি-ভাষা ইতঃপূর্ব্বেই তিনি কিছু কিছু জানিতেন। এথন তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া তিনি চেল্‌টেনহাম (Chelten ham) মহিলা কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ লাভ করিলেন। এই স্থানে তিনি বার বৎসর অবস্থান করেন, এবং নিজে ইংরাজি সাহিত্য, গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তাহার শুভানুষ্ঠানের প্রধান উৎসাহদাত্রী শ্রীমতী আনন্দবাই যোসী (Mrs Anandi bai Johsi) আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ায় (Philadelpheia) চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তিনি রমা-বাইকে আমেরিকায় যাইতে অনুরোধ করেন। তাঁহার সাদর আহ্বানে; রমাবাই ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় গমন করেন।

আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি সেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষভাবে আলোচনা করেন; কারণ, ভারতে স্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রকৃষ্ট পথ তিনি তথনও খুঁজিয়া পান নাই। তথন স্বনামধন্য জর্ম্মনশিক্ষা-সংস্কারক ফ্রোবেলের প্রবর্ত্তিত কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালী আমেরিকায় প্রচলিত হইয়াছিল। এই শিক্ষাপ্রণালী রমাবাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহা ভারতীয় স্ত্রীজাতির পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া, তিনি এই শিক্ষাপ্রণালী বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি বলেন—'ফ্রোবেলের শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে আমি লৌকিক (Secu lar) ও আধ্যাত্মিক (spiritual) শিক্ষার প্রকৃত সমাবেশ দেখিতে পাই। প্রথমতঃ ফ্রোবেলের শিক্ষাপ্রণালীতে বালকের জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ পরিচালিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তাশক্তিরও উন্মেষ হয়। কাজেই এই শিক্ষাপ্রণালী-দ্বারা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ, সত্যই ফ্রোবেলের শিক্ষা প্রণালীর প্রাণ। সুতরাং, এই শিক্ষা-প্রণালী ভারতে অনুসৃত হইলে কুসংস্কারমূলক মোহান্ধকার হইতে ভারতসমাজ নির্ম্মুক্ত হইবে, এবং বন্ধনোন্মুক্ত হইয়া ভারতললনা স্বীয় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ হইবে।

তিনি আরও বলিতেন—"আমি ভারতের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মাতৃহৃদয় অধিকার করিতে বাসনা করি। সন্তানের মঙ্গলেচ্ছা মাতৃহৃদয়কে যেরূপ আকর্ষণ করে, পৃথিবীর অপর কিছুই ইহাকে সেইরূপভাবে আকর্ষণ করিতে পারে না। কিণ্ডারগার্টেন-শিক্ষাপ্রণালী যদি তাহাদের সম্মুখে যথোপযুক্তভাবে সমুপস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে, তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, সন্তানের ভবিষ্যৎ উন্নতি অনেকটা জননীর উপর নির্ভর করে। ভারতীয় রমণীগণ শিশুসন্তানগণের শিক্ষার জন্য বুদ্ধি-ও বিবেচনা-পূর্ব্বক যদি

উপযুক্ত পরিমাণে যত্ন গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহাদের সন্তানগণের অমঙ্গল সংঘটিত হইবে—এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, তাঁহাদের স্নেহপ্রবণ সন্তানবৎসল মাতৃহৃদয় স্বতঃই স্ত্রীজাতির শিক্ষার ও উন্নতির প্রতিবন্ধক দূর করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইবে।" রমাবাই এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া ভারতবর্ষে স্ত্রীজাতির মধ্যে কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রণালীর প্রচলন করিতে মনন করেন এবং কিণ্ডারগার্টেন-শিক্ষাপ্রণালী-সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে জ্ঞানলাভের জন্য তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষকদের এক ট্রেনিং স্কুলে ছাত্রীরূপে প্রবেশ করেন। তথাকার সুন্দর সুন্দর চিত্রসংবলিত, পুরু কাগজে বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত, শোভন মলাটযুক্ত শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মারাঠী ভাষায় শিশুদের জন্য ঐ প্রকার-পুস্তক প্রকাশ করিবার কল্পনায় তিনি আমেরিকার অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি সংগ্রহ করেন। এখন বঙ্গদেশে নানাপ্রকার বিচিত্র চিত্র বক্ষে ধারণ করিয়া, বহু পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। কোথাও বা চিত্রের সদ্ব্যবহার হইতেছে, আর কোথাও বা উহার অপব্যবহার হইতেছে। পণ্ডিতা রমাবাই প্রায় তিনযুগ পূর্ব্বে যে সত্যটি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, বাঙ্গালী এতদিন পরে সে সত্যটি কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছে।

আমেরিকার ন্যায় স্বাধীন দেশের সংস্পর্শে আসিয়া এবং তথাকার স্ত্রীজাতির উন্নত অবস্থা দেখিয়া রমাবাইর স্থির বিশ্বাস জন্মিল যে, স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন করিতে না পারিলে ভারতের উন্নতি সুদূরপরাহত। তাই তিনি ঘৃণিত, অবহেলিত ভারতীয় বিধবাকুলের দুর্দ্দশামোচনে বদ্ধপরিকর হইলেন। অনাথা, আশ্রয়হীন বিধবাগণ আমাদের সমাজে কিরূপ দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করে, তাহাদিগকে গলগ্রহস্বরূপ মনে করিয়া আমাদের নিষ্ঠুর সমাজ তাহাদিগকে কিরূপ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা প্রদান করে, তাহা তিনি অবগত ছিলেন। উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া বিধবাগণ যাহাতে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিয়া নিগ্রহের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে, তিনি তাহার উপায়-নির্দ্ধারণে নিযুক্ত হইলেন।

অচিরকালমধ্যে তাঁহার কার্য্যপ্রণালী স্থির হইল। তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিধবাগণের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। বিধবাগণের দুঃখদুর্দ্দশামোচন তাহার জীবনের ব্রত হইল। ভারতে বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আমেরিকায় অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। হিন্দু বালবিধবাদের দুঃখ নিবারণোদ্দেশ্যে আমেরিকায় বোষ্টন-নগরে 'রমাবাই'-সমিতি নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। সুসভ্য আমেরিকাবাসীর সহানুভূতিলাভ-প্রয়াসে রমাবাই 'উচ্চজাতীয় হিন্দুস্ত্রী' নামে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তাহাতে হিন্দুসমাজের বালবিধবাগণের জন্য কিরূপ কঠোর নিয়ম-সকল প্রবর্ত্তিত আছে, তাহা তিনি তাঁহার প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণন করেন।

ভারত সমাজে বিধবাকে কিরূপ হীনজীবন যাপন করিতে হয়, সমাজ তাহার উপর কিরূপ

নির্ম্মম ও কর্কশ ব্যবহার করে,—তাহা তিনি সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহার সঙ্গে বাল্যবিবাহ-প্রথা, বালিকাবধূর প্রতি শ্বশ্রূদেবীর অত্যাচার, শিশুকন্যা-হত্যা প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথাসমূহও আমেরিকাবাসীর গোচরীভূত করিয়া ভারতীয় স্ত্রীজাতির দুঃখমোচনে তাহাদের সহানুভূতি ও সহায়তা প্রার্থনা করেন। এইরূপে দুই-বৎসরকাল আমেরিকার নগরে নগরে ভ্রমণ করিয়া তিনি অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। প্রায় বাট হাজার টাকা সংগৃহীত হইলে, তিনি তাঁহার অভীষ্ট কার্য্যের সূচনায় জন্য দেশে প্রত্যাগমন করেন। তিনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী বোম্বাই-নগরে পদার্পণ করেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া ১১ই মার্চ্চ তারিখে তথায় বিধবাশ্রম-প্রতিষ্ঠা করেন।

এই বিধবাশ্রমে 'বাইবেল' শিক্ষাদিবার জন্য অনেক মিশনরী বন্ধু তাঁহাকে অনুরোধ করেন। রমাবাই নিজেও কালে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি তাহার স্বভাবতঃই একটা টান ছিল। কিন্তু তিনি যে উদার ভাব লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতের সঙ্কীর্ণগণ্ডি স্থাপন করিয়া তাহা অনুদার-ভাবদুষ্ট করিতে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। বিশ্বমানবের সেবায় যিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, জাতিধর্ম্ম বা দেশকালের ভেদাভেদ কি তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে? সার্ব্বভৌমিক প্রেমের বন্যা যে হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়াছে, সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র বাঁধ কি সেখানে টিকিতে পারে? তিনি দেখিলেন যে, বিধবাশ্রমে বাইবেল-পাঠ বাধ্যতামূলক করিবার প্রস্তাব তিনি যদি গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইবে, তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইবে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মমত বিধবাশ্রমে স্থান পাইলে হিন্দুবিধবাগণ তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবেন না। সুতরাং, ভারতের নিগৃহীত দুঃস্থ হিন্দুবিধবাগণের দুর্গতিবিমোচনে তিনি কিছুতেই সফলতা লাভ করিতে পারিবেন না। তাই বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় ভারতীয় বিধবাদিগকে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জনের উপযোগী শিক্ষা প্রদান করাই তাহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইল। তিনি মিশ-নারীগণের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও তাঁহার সঙ্কল্পসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া দ্বিগুণতর উৎসাহ-সহকারে স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বিধবাশ্রম-প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। এইরূপ নানাবিধ নারীহিত কার্য্যে তাঁহার পূতজীবন অতিবাহিত হইল।

গান।

আমি যত দিই ফাঁকি, যত করি ছল,
যত করি বঞ্চনা,—
কিবা অভিলাষী,
কত ভালবাসি,
প্রভু, তোমার তা আছে জানা!

বিপদে অভাবে দোষি তোমায়,—
তোমারি দেওয়া লাঞ্ছনা!
সুখেরি মাঝারে
কত মনে পড়ে,
প্রভু, তোমার তা আছে জানা!

মুখে বলে যাই সোজা, ওগো প্রিয়তম!—
হায় রে প্রবঞ্চনা!
কতটুকু সত্য
তুমি জান তত্ত্ব,
প্রভু, তোমার তা আছে জানা!—
ধেয়ান গেয়ান মোর ভজন সাধন,
যত করি অর্চ্চনা!
বাসনা, কামনা
প্রার্থনা, ধারণা,
প্রভু, তোমার তা আছে জানা!
আমি আপনারে লয়ে লুকায়ে লুকায়ে
যত করি কল্পনা,
পাছে লোকে শুনে
হাসে মনে মনে,
প্রভু, তোমার তা আছে জানা!

শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা

লোচন রায়

(Scott এর Lochinvar-নামক কবিতার অনুকরণে)

পশ্চিম হ'তে তরুণ যুবক এসেছে লোচন রায়!—
অতিপ্রিয় তার তুরগের সেথা তুলনাটি
মেলা দায়!
যোদ্ধার সাজ নাহিক অঙ্গে, নাহিক সেনার
সারি,
কটিতটে শুধু দুলিছে বঙ্কু বিশ্বাসী তরবারী।
প্রণয়ের গীতে বিভোর পরাণ, সমরের মাঝে
নির্ভীক মন;—
ছিলনা কখন প্রেমিক এমন, যেমন লোচন রায়
কানন তাহার রোধেনিক' পথ, লঙ্ঘি' এসেছে
কত পর্ব্বত,
অবহেলে পার হয়েছে যুবক 'অসিকা'র সেই
খরতীর-স্রোত!
নন্দনগড়-তোরণের দ্বারে উপনীত যবে
হইল কুমার,
কালের আঘাতে ছিঁড়ে গেছে তা'র কোমল
স্নিগ্ধ প্রণয়ের হার!
প্রাণের অলকা লভিবে অলস পুরুষ শৃগাল-
প্রায়?—
দারুণ বেদন পরাণে কেমনে সহিবে লোচন
রায়!
নন্দনগড়ে পশিল লোচন ভরসা বক্ষে লয়ে;
অলকার ভ্রাতা আত্মীয় যত আসিল সকলে
ধেয়ে।
ভীরু যুবা সে যে, রহিল দাঁড়ায়ে শির অবনত
করি,
অলকার পিতা আসি কয় কথা হস্তে অস্ত্র
ধরি,—
'শান্তি চাহ কি যুদ্ধ-মানসে এসেছ আজি
হেথায়?
অথবা চাহ কি উৎসব-স্বাদ, তরুণ লোচন রায়?'
'বহুদিন ধরি' তনয়া তোমার ছিল মোর
ধ্রুবতারা;
জাহ্নবী-সম প্রণয়-বন্যা হয়েছিল কূলহারা!
উদ্দাম স্রোত দূরে সরি গেছে অসরস হৃদি
ত্যজি;
এসেছি ভুলিয়া পুরাতন স্মৃতি, হোলি খেলিবারে
আজি।

এ ভারতভূমে কত বালা আছে উজল রূপ-
বিভায়,
তাদের মধ্যে পত্নী খুজিবে যুবক লোচন রায়।'
কুঙ্কুম-রাশ তুলিল অলকা কম্পিত নিজ করে ;
ইন্দ্রধনুর ওড়না উড়ায়ে ঘিরে সখী চারি ধারে।
অস্ফুট শ্বাস হৃদয়ে চাপিয়া, সলাজে তরুণী
রহিল চাহিয়া ;
নয়ন-কোণেতে বিন্দু অশ্রু, অধরে হাস্য ঝরে।
সখীগণ যত সর্প-আকার শৃঙ্গক ভরি' লয়,
রঞ্জিয়া দিল যতেক বসন; হাসিল লোচন রায়।
সুন্দর বীর, রূপসী কিশোরী লোহিত বর্ণে সাজে,
নৃত্য-মুখর চরণ ফেলিয়া ভ্রমিল আঙিনা মাঝে।
পিতার ভ্রূকুটি মাতার চাহনি প্রমোদে হেরিল
কেবা!
শুষ্কবদনে রহে এক-ভিতে কাপুরুষ সেই যুবা।
সখীগণ সবে করে কাণাকাণি, 'কি সুখ হইত,
হায়!
(যদি) মোদের স্নেহের সঙ্গিনী সনে মিলিত
লোচন রায়!

আপনা ভুলিয়া যত নরনারী হোলি-উৎসবে
মিলে ;
(দৌড়ে) অঙ্গন-দ্বার সমীপে আসিল বদ্ধ তুরগ-
পাশে ;
(সে) হস্ত পরশি, কর্ণে বালার মন্ত্র পড়িল
কি যে,
অশ্বপৃষ্ঠে তুলি অলকায় বসিল পিছনে নিজে,
'লভেছি আমার প্রেমের প্রতিমা, যুগল চলিয়া
যায়',
সাধ্য থাকে ত' নিবার তাদের'—হাঁকিল
লোচন রায়।
'নন্দনগড়ে সেনানী যাহারা উঠিল অশ্ব'পরি,
চোহান্ চন্দাবতের মধ্যে পড়ে গেল হুড়াহুড়ি ;
'কানোয়া'র মাঠ ক্ষুর-ধুলিজালে হইল যে
একাকার
নন্দনগড়-নন্দিনী তা'রা কভু না হেরিল আর।
প্রণয়ে এরূপ অগম-সাহসী, রণমাঝে নির্ভয়,—
দেখেছ কি কভু এমন প্রেমিক যেমন লোচন
রায়?

সংবাদ।

১। বঙ্গদেশের শ্রমজীবীদের মধ্যে যে অসন্তোষ ও ধর্ম্মঘটের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কারণ-নির্দ্দেশ করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মিঃ কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট এক কমিটি স্থাপন করিয়াছেন।

২। ঢাকার অন্তর্গত জয়দেবপুরের দ্বিতীয় রাজকুমার ১২ বৎসর পূর্ব্বে দার্জিলিংএ দেহত্যাগ করেন, বলিয়া প্রকাশ। সম্প্রতি এক ব্যক্তি সন্ন্যাসীর বেশে জয়দেবপুরে আসিয়া 'আমার মৃত্যু হয় নাই, আমিই দ্বিতীয় রাজকুমার' বলিয়া পরিচয় দিয়াছে।

৩। জাপানের যুবরাজ বিলাতে গমন করিয়াছেন। ৭ই মে যুবরাজ ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছেন।

৪। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, এবার কলিকাতার আদম-সুমারী বা সেন্সাস গণনা ঠিকমত হয় নাই বলিয়া সন্দেহ জন্মিয়াছে। পুনরায় কয়েকটী স্থানের গণনা করিতে

হইবে। ইহার জন্য না-কি তিন হাজার টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

৫। এইরূপ প্রকাশ যে, আগামী শীত ঋতুতে ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারত-পরিদর্শনে আসিবেন।

৬। আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, ও এম, এস-সি পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

৭। ইংলণ্ডের কয়লার খনির শ্রমজীবিগণের ধর্ম্মঘট এখনও শেষ হয় নাই। তথাকার গবর্ণমেণ্ট অস্থায়িভাবে চারি মাসের জন্য শ্রমজীবিগণের সাহায্য-কল্পে ৭৫০০,০০০ পাউণ্ড হইতে ১০,০০০,০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিবেন বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু খনি-জীবিগণ ইহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। শ্রমজীবিগণের দুর্দ্দশার সীমা নাই। স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাদের খাওয়াইবার জন্য তাহাদের চাঁদার খাতা খোলা হইয়াছে।

৮। বোম্বাইয়ের ডাকঘরে গত বার মাসের মধ্যে শিরোনামবিহীন ১৫লক্ষ চিঠি জমা হইয়া পড়িয়া আছে। এই সকল পত্রের মধ্যে কোনও পত্রে ১, ২৯, ৭৪১টাকার হুণ্ডী বা চেক পুরিয়া পাঠান হইয়াছে, কোনও পত্রের ৭১২৲টাকার নোট আছে, কিন্তু লেখক শিরোনামা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

৯। কলিকাতার ১৷২এ, নং প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটে "সেণ্ট্রাল এণ্টি ম্যালেরিয়াল সোসাইটি" নামে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে। এই সভা বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে ম্যালেরিয়া-বিনাশের চেষ্টা করিবেন। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে এই সভায় পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন; পুনরায় পাঁচ হাজার টাকার দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

১০। শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টরের সুপারিশে গবর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এ-দেশে রং আমদানীর উপর আর কোন রকম শাসন রাখা হইবে না।

১১। আগামী জুলাই মাসে বিলাতের অক্সফোর্ড সহরে আন্তর্জ্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়-সভার এক অধিবেশন হইবে; এই মহা-সম্মিলনে যোগ দিবার জন্য কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রিন্সিপ্যাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যার নীলরতন সরকার বিলাত-যাত্রা করিয়াছেন। স্যার নীলরতন সরকার-মহাশয়ের পত্নীও এই সঙ্গে বিলাতে গিয়াছেন।

১২। ফ্রান্সে গত ৯ই মে জোয়ান অব আর্কের স্মৃতি-উৎসব হইয়া গিয়াছে। জোয়ান অব আর্ক ফ্রান্সের এক কৃষক-বালিকা। ফ্রান্স যখন আত্মশক্তি-সাধনার অভাবে জড়বৎ পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল, সেই সময় এই বালিকা যেন দৈবশক্তি-সম্পন্না হইয়া আসিয়া ফ্রান্সের জড়দেহে প্রাণ-সঞ্চার করিয়াছিলেন।

১৩। কিছুদিন পূর্ব্বে পাশ্চাত্ত্য জ্যোতির্বিদ্গণ স্থির করেন যে Pons-Winnecke (পন্স্-উইনেক)-নামক একটি ধূমকেতু বর্ত্তমান বর্ষের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইবে এবং আগামী জুন মাসে তাহার সহিত পৃথিবীর সংঘর্ষ ঘটিবে। কিন্তু গত ১০ই এপ্রেল, জনৈক আমেরিকা-বাসী জ্যোতির্ব্বিদ অধ্যাপক বার্নার্ড, এই ধূমকেতুর অবস্থিতি-স্থান নির্দ্দেশ করেন এবং গণনায় প্রকাশিত হয় যে পৃথিবী

সেই সংঘর্ষের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবার প্রায় ১০দিন পূর্ব্বে এই ধূমকেতুটী পৃথিবীর পরিভ্রমণ-পথটীকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবে। ইহাতে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বড়ই হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। এই ধূমকেতুটী ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ফরাসী দেশের পন্‌স কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়, এবং পরে উইনেক্‌ কর্ত্তৃক পুনরাবিষ্কৃত হয়। এই জন্যই উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে।

এই ধূমকেতুটী সওয়া পাঁচ বৎসর অন্তর এক একবার আমাদের নিকট আসিয়া দেখা দেয়। জুনমাসে এই ধূমকেতুটী পৃথিবী হইতে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিতি করিবে বটে, কিন্তু তাদৃশ উজ্জ্বলভাবে দেখা যাইবে না। অনুমান ২৭শে জুন তারিখে ভীষণ উল্কাপাত হইবে, পণ্ডিতেরা এইরূপ মনে করেন। পৃথিবীর সহিত সংঘর্ষ হইলে কি ফল হইতে পারে, তদ্বিষয় অনেক খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ্‌ বলিয়াছেন—"উইনেকের ধূমকেতুটী যখন পৃথিবীর দিকে এবার আসিতেছিল, তখন আবার প্রশ্ন শুনা গেল—'ধূমকেতুর সহিত সংঘর্ষ হইলে পৃথিবীর কি হইবে?' তিনি বলেন্‌ যে, আমরা যদি কখনও ধূমকেতুর পুচ্ছের মধ্যে গিয়া পড়ি, তাহা হইলে আমরা তাহা জানিতেও পারিব না; এবং ঐ পুচ্ছের ধূমপুঞ্জে যদি কোনও বিষাক্ত কিছু থাকে, তাহা হইলেও বাষ্পপুঞ্জের অধিক বিশ্লেষণ-হেতু তদ্দ্বারা কোনও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। যুগে যুগে পৃথিবী বহুবার বহু ধূমকেতুর ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে লেক্সেলের ধূমকেতু এবং ১৯১০ সনে হেলির ধূমকেতুর পুচ্ছের ভিতর দিয়া পৃথিবী চলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বিশেষ কোনও অনিষ্টের চিহ্ন দেখা যায় নাই। তিনি বলেন, কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, পুচ্ছের সহিত সংঘর্ষে কোনও ফল না হইলেও, ইহার মস্তকের সহিত সংঘর্ষে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। কিন্তু নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে যে, এই মস্তকটী জড়পিণ্ড নহে। উল্কা যে পদার্থে গঠিত, ইহাও সেই পদার্থের সমবায়ে গঠিত; এই পদার্থগুলির পরস্পর অহর্নিশ সংঘর্ষণে উহা আলোকময় হইয়া গিয়াছে। যদি ঐ মস্তকের সহিত সংঘর্ষ হয়, তাহা হইলে ভীষণ উল্কা-বৃষ্টি ব্যতীত যে কিছু ঘটিবে, তাহা মনে হয় না। প্রাচীন কালেও এইরূপ জ্যোতিষ্কাদির সহিত সংঘর্ষের ফলে যে পৃথিবীর দারুণ ক্ষতি হইয়াছিল, এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে একটী যে এইরূপ সংঘর্ষ হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি আমেরিকার একটী গভীর উপত্যকার সন্নিকটে আছে। এই স্থান একটী আগ্নেয়-গিরির গহ্বর। আমাদের বায়ুমণ্ডল জ্যোতিষ্কাদির উৎপীড়ন হইতে আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে। নতুবা পৃথিবীতে জীবন-ধারণ বড়ই সংকটময় হইত। পৃথিবীর সহিত ধূমকেতুর সংঘর্ষে কোনও বিশেষ অনিষ্ট হইবে না। কারণ, ধূমকেতুর উপাদান পদার্থগুলি বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসিবামাত্র বাষ্পে পরিণত হইয়া যাইবে।

অষ্টাবক্রগীতা।

উপদেশের তাৎপর্য্য।

(১)

কিয়ৎকালপূর্ব্বে অষ্টাবক্রগীতার মূল ও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার উপদেশের তাৎপর্য্যটী প্রকাশিত হইতেছে। অষ্টাবক্রগীতা জ্ঞানের চরম গ্রন্থ। ইহার উপদেশ হৃদয়ঙ্গম হইলে, কাহারও কোন প্রকার দুঃখের অবসর থাকে না। এই গ্রন্থ একবারমাত্র বুঝিয়া পড়িতে পারিলেই, লোকের সকল প্রকার তাপের আত্যন্তিক উপশম অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে এই মহাগ্রন্থের উপদেশের তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের চেষ্টাও মহাফলপ্রদ।

এই গ্রন্থের মতে 'আমি', 'তুমি', 'রাম', 'শ্যাম', সকলেই নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব সচ্চিদানন্দমাত্র। উহা একটী চেষ্টা-দ্বারা লভ্য অবস্থামাত্র নহে। পরন্তু উহাই আমাদের স্বভাব, আমরা উহাই চিরকাল আছি এবং থাকিব। ঐ স্বভাব হইতে আমরা কখনও বিচ্যুত হই নাই এবং হইবও না। আমাদের ইহাই স্বরূপ; ইহার ক্ষয়ও নাই, বৃদ্ধিও নাই। অর্থাৎ আমরা বস্তুতঃ যাহা, তাহাই চিরকাল আছি ও থাকিব; তাহা কেহ কখনও নষ্ট করিতে পারে নাই, এবং কখনও পারিবে না। আমরা বস্তুতঃ চিন্মাত্র, বোধস্বরূপ। আমরা ক্ষয়বৃদ্ধি-রহিত, অদ্বয়, অপরিবর্ত্তনীয় বোধমাত্র। এই কূটস্থ (বা অপরিবর্ত্তনীয়) বোধমাত্র জিনিষটী কি তাহা নিজে চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইবে, বাক্যের দ্বারা তাহা বুঝান যায় না। তথাপি ঐ জিনিষটী বুঝিবার জন্য কেহ কেহ এইরূপ ইঙ্গিত করেন যে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থায় আমাদের যে ভাবটী সাধারণভাবে থাকে, যাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না, তাহাই আমাদের স্বভাব, তাহাই কূটস্থ বোধমাত্র বা আত্মা। যেমন সমুদ্র জলরাশি-মাত্র, তাহার কখন বিক্ষুব্ধ ভীষণ তরঙ্গযুক্ত অবস্থা হয়, কখন বা প্রশান্ত স্থির অচঞ্চল অবস্থা হয়; আমরাও সেইরূপ কেবল বিশুদ্ধ চৈতন্যমাত্র, কিন্তু অনাদি মায়ার প্রভাবে সুপ্ত জাগরিত প্রভৃতি নানা অবস্থায় প্রতিভাত হই। আমাদের জাগ্রদবস্থায় একটী ব্যক্তিত্ব প্রতিভাত হয়—আমি অমুক-বংশোদ্ভূত, অমুক পিতামাতার অমুকনামযুক্ত অমুককর্ম্মকারী ব্যক্তিবিশেষ। এই ভাবকেই আমরা সাধারণতঃ 'আমার আমিত্ব' বলিয়া বুঝি। বস্তুতঃ কিন্তু এইরূপ আমিত্ব বা ব্যক্তিত্বকে আত্মা বলা যায় না। কেন না, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আত্মা কূটস্থ বোধমাত্র, কিন্তু আমাদের ব্যক্তিত্ব কূটস্থ বস্তু নহে। কিন্তু এই ব্যক্তিত্বের পরিবর্ত্তনশীল অংশগুলি বর্জ্জন করিলে আমরা হয় ত নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ আত্মাকে বুঝিতে পারি। আমরা যখন জাগরিত থাকি, তখন সাধারণতঃ একটা জ্ঞান লইয়াই থাকি; হয় কিছু দেখিতেছি, না হয় কিছু শুনিতেছি, অথবা কিছু করিতেছি ইত্যাদি। আমাদের স্বরূপ নিত্যচৈতন্যময় বলিয়াই আমরা এ সমস্ত করিতে সমর্থ হই, এবং এই সকলের প্রত্যেক

ব্যাপারেই আমাদের সেই স্বরূপের প্রকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু এ-সকল ব্যাপার না থাকিলেও আমাদের স্বরূপ-প্রকাশ না হইবার কোনও কারণ নাই। কেননা, আমাদের স্বরূপ স্বপ্রকাশ। সে যাহাই হউক, জাগরিত অবস্থায় দর্শন-স্পর্শনাদি প্রত্যেক ব্যাপারেই যে আমাদের নিত্যোপলব্ধিস্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। বস্তুর জ্ঞান হইতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে আত্মজ্ঞানও হয়। কিন্তু এই আত্মজ্ঞানের সহিত বাহ্যবস্তুর জ্ঞান এরূপভাবে বিজড়িত থাকে যে, বাহ্য বস্তুরই জ্ঞান জন্মে আত্মার সম্বন্ধে কোনপ্রকার স্থির ধারণাই জন্মে না। এইজন্ত আত্মার স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মত পণ্ডিতগণের গ্রহণীয় হয় না। যখন কোন বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন আমরা তাহার জ্ঞান লাভ করি; এইরূপ আমার পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তু আমরা স্মরণ করিতে পারি, বা তৎসম্বন্ধে কল্পনাও করিতে পারি। কিন্তু এই সকল ব্যাপারে আমাদের যে জ্ঞান জন্মে, আত্মা তাদৃশ জ্ঞানস্বরূপ নহে। কারণ, এইরূপ কোন বিশেষ হেতুজন্ম উৎপন্ন জ্ঞান উৎপত্তিবিনাশশীল, কিন্তু আত্মা নিত্য-অনাদি অব্যয়। অতএব যখন আত্মাকে জ্ঞানস্বরূপ বলা হয়, তখন এইরূপ বিশেষ কারণোৎপন্ন বিষয়জ্ঞানকে উদ্দেশ করিয়া বলা হয় না; কিন্তু যে নিত্য চৈতন্ত থাকার জন্ত আমরা চেতনজীব, যে বোধশক্তি থাকার জন্ত আমরা বাহ্যবস্তু বুঝিতে পারি, তাহাই আত্মার স্বরূপ, তাহা চিরকাল একরূপ, তাহাই কূটস্থ চৈতন্ত। এই যে, বোধশক্তি যাহার জন্ত বাহ্যবস্তু আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, এবং এই বোধস্বরূপ আত্মা উভয়ই এক পদার্থ। এজন্তই বলা হয়, শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই। যখন কোন বস্তুর জ্ঞান হয়, তখন যে বোধের উদ্রেক হয় বলিয়া মনে হয়, তাহা হইতে বস্তুগত অংশ পরিত্যাগ করিলে যে কেবল জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে, তাহাই কূটস্থ বোধমাত্র; যে চৈতন্য-ভাব থাকার জন্ত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষে জ্ঞানের উৎপত্তি হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তাহাই কূটস্থ চৈতন্ত। কেহ কেহ মনে করেন, কূটস্থ চৈতন্ত বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই; যখনই কোন বিষয়েন্দ্রিয়ে সংযোগাদিরূপ কারণ উপস্থিত, তখনই জ্ঞানের উন্মেষ হয়; নিত্যোপলব্ধিস্বরূপ বলিয়া কিছু নাই। যখন কোন কিছু দেখিতেছি, তখন জ্ঞান জন্মিতে পারে; কিন্তু জ্ঞানের কোন বিষয় নাই, অথচ জ্ঞান আছে, ইহা স্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের মতে ইহা ঠিক নয়। আত্মা স্বপ্রকাশ, আত্মার প্রকাশ্য কোন কিছু থাকে, তাহা প্রকাশিত হইবে, কিন্তু কোন প্রকাশ্য বস্তু উপস্থিত না থাকিলে, আত্মার প্রকাশের হানি হইবে—ইহা বলা চলে না। একটা দৃষ্টান্ত দেখুন—একটি আলোক আছে; যদি কোন বস্তু তাহার নিকটে লইয়া যাওয়া হয়, আলোক-শিখার দ্বারা তাহা প্রকাশিত হইবে; কিন্তু যদি যতদূর পর্য্যন্ত ঐ আলোকশিখার প্রকাশের ক্ষমতা আছে, তাহার মধ্যে প্রকাশ্য কোন বস্তুই না থাকে, তাহা হইলে কি আলোক আলোকিত থাকিবে না? অবশ্যই থাকিবে। সেইরূপ সন্নিকর্ষাদিরূপ কারণের অভাববশতঃ

যদি কিছু প্রকাশ্য না থাকে, তাহা হইলেই কি আত্মার স্বপ্রকাশত্বের হানি ঘটিবে? কখনই না। বরং আত্মা স্বস্বরূপেই চিরবিরাজমান; আমাদিগের ভ্রম-বশতঃই তাহাকে যেন সংসারী বলিয়া মনে হয়। অতএব জাগ্রদ্ অবস্থার নানাভাবের মধ্যে ইহাই কেবল বুঝিতে হইবে যে, কোন্ ভাবটী সর্ব্বাবস্থায় অনুগত বা সাধারণ। কারণ, তাহাই আত্মার স্ব-ভাব। বিচারানুভবের দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, অদ্বয় কূটস্থ বোধমাত্রই সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আছে। জাগ্রদবস্থায় আমাদের ব্যক্তিত্ব অনেকস্থলে অনুগত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু স্বপ্নে বা সুষুপ্তিতে অন্ততঃ ব্যক্তিত্ব মোটেই থাকে না। অতএব ব্যক্তিত্ব মায়া হইতে উৎপন্ন বস্তু; কূটস্থ জ্ঞানই একমাত্র তত্ত্ব। এই অখণ্ড অদ্বয় কূটস্থ চৈতন্য ক্ষয়-বৃদ্ধি-রহিত। অতএব ভোগের দ্বারা ধনাদি অর্জ্জনের দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে তাহার পুষ্টি সাধন অসম্ভব। ত্যাগের দ্বারাও তাহার কোন অপচয় নাই। অতএব ভোগত্যাগ-সাধনাদি সমস্তই নিরর্থক। কেবল স্বরূপের বোধই একমাত্র প্রয়োজন। স্বরূপের বোধ জন্মিলেই চিরশান্তি লাভ হইবে। স্বরূপের বোধেই সকল দুঃখের অবসান। স্বরূপাবস্থিতিই চরম লাভ।

শ্রীধীরেশচন্দ্র শাস্ত্রী।

খুড়ি-মা।

শুনিতে পাওয়া যায়, যখন রায়েদের পূর্ব্বপুরুষ মহেশ রায় রায়বাড়ী তৈয়ার করাইতে আরম্ভ করাইয়াছিলেন, তখন ভিত্তি-খননের সময় ভূমি হইতে কয়েকটি ভীমকায় বিষধর বাহির হইয়াছিল এবং কাহারও কোন ক্ষতি না করিয়া নিকটস্থ বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছিল। নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হইলে রায়-বাড়ীতে মনসাপূজার ঘটা কিছু বেশী হইল—আর বর্ষাকালের পঞ্চমী-কয়টাও পালন করিবার নিয়ম হইয়া গেল। সে কয়দিন রায়-বাড়ীতে উনান জ্বলিত না। রায়-ভবনের বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক সকলকেই কয় কলায়ের না হয় গতরাত্রের জল দেওয়া ভাত সেবা করিতে হইত। জমীদার গিরিশ রায় কখন ও-সব খাইতে পারিতেন না। নিকটেই চৌধুরীদের বাড়ী। চৌধুরী-গৃহিণীকে তিনি খুড়িমা বলিতেন ও বর্ষাকালের পঞ্চমী তাঁহার নিকটে গিয়া পালন করিয়া আসিতেন।

আজ বৎসরের প্রথম পঞ্চমী পালন করিবার দিন, কিন্তু এখনি মকদ্দমা উপলক্ষে গোয়াড়ী যাইতে হইবে। গিরিশবাবু বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, খুড়িমার নিকট হইতে কেহ আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া যায় নাই। তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে এ নিমন্ত্রণের ত কখন ব্যতিক্রম হয় নাই। গঙ্গার চর দখল লইয়া যে লাঠি-বাজি হইয়াছে, তাহাতে কি খুড়িমার স্নেহের বাঁধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে? ভাবিবার সময় ছিল না। বাহিরে বরকন্দাজ ও বেহারা দাঁড়াইয়া আছে। এবার মকদ্দমা গুরুতর, তাঁহাকে নিজে যাইতে হইবে। আর বিলম্ব করা চলে না।

পাল্কী আসিয়া বরাবর চৌধুরী-বাড়ীর

দরজার সম্মুখে থামিল। বরকন্দাজদের অগ্রসর হইবার আদেশ দিয়া গিরিশ রায় পাল্কী হইতে নামিলেন। বিশাল হেম-গিরির মত আকৃতি। বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ লইয়া উন্নত-শিরে ধীর-পাদবিক্ষেপে যখন তিনি দেউড়ীতে দরোয়ানদের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন, সেই পরিচিত তেজোব্যঞ্জক-মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। পাইকদের অধিকাংশ সকালেই গোয়াড়ী চলিয়া গিয়াছে। কারণ, তাহারা যে আজ সাক্ষী। যাহারা ছিল তাহারা অনায়াসেই সে-দিনের অপমানের প্রতিশোধ লইতে পারিত, কিন্তু সে কথাও তাহাদের মনে উদয় হয় নাই। কেবল দুইজন অল্পবয়স্ক নূতন ভোজপুরী, যাহারা একমাস পূর্ব্বে গঙ্গার রক্তসিক্ত সৈকত হইতে সকলের অগ্রে আসিয়া চৌধুরীবাড়ীতে সংবাদ দিয়াছিল যে, রায়েদের লেঠেলে চর অধিকার করিয়া লইয়াছে, তাহারাই কেবল রোষ-কষায়িত লোচনে সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিল। গিরিশ রায় যাইবার সময় একটি বার মাত্র তাহাদের উপর দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন আর মন্ত্রশান্ত সর্পের মত তাহাদের ক্রুদ্ধদৃষ্টি নত হইয়া গেল। যখন তাঁহার দীর্ঘদেহ দৃষ্টিপথ-বহির্ভূত হইল, তখন একজন ভোজপুরী বলিল, "সেদিন ঐ লোকের জন্যই বাপের ডাইন হাত ও শিরে চোট্ লাগিয়াছিল, আমার ইচ্ছা হইতে—।" বাধা দিয়া বৃদ্ধ দরোয়ান লালসিং বলিল, "যা ইচ্ছা হইয়াছিল তা' সেদিনই করিতে পারিতে। আজ বাবু গিন্নী-মাকে প্রণাম করিতে যাইতেছে, বাড়ীর ভিতর আপনি আসিয়াছে, আজ ওসব কথা ভাবিস্ নে খবরদার।

অন্দরে প্রবেশ করিয়া গিরিশবাবু ডাকিলেন, 'খুড়িমা! খুড়িমা কোথায়! বিরাট কণ্ঠের সে মেঘ-গম্ভীর স্বর শুনিয়া বউ-ঝিরা সরিয়া গেল। চৌধুরী-গৃহিণী তাড়াতাড়ি দালানে আসিলেন। গিরিশ রায় তাঁহাকে প্রণাম করিলেন;—উঠিয়া বলিলেন, 'খুড়িমা, আজ পঞ্চমী, তোমার কি তা' মনে নাই? তুমি আমাকে ডাক নাই, আজ আমি না খাইয়া গোয়াড়ী যাইতেছি।' মর্ম্মের বড় কোমল স্থানে কথাটা গিয়া বাজিল। গিরিশের মাতার মৃত্যুর পর তাহাকে প্রথমে তিনিই স্তনদুগ্ধ পান করান। বাল্যকালে তাহার কতদিন চৌধুরী-বাড়ীতে কাটিয়া গিয়াছে। তারপর পঞ্চমীর দিনগুলিতে তাহাকে সযত্নে আহার করাইয়া চৌধুরী গৃহিণী যে আরাম ও তৃপ্তি উপভোগ করিতেন, তাহা মনে পড়িল। আরও স্মরণ হইল, এই ব্রহ্ম-মূর্ত্তি দুর্দ্দান্ত ব্রাহ্মণ তখন শান্ত শিষ্ট শিশুর মত কিরূপ নিরীহ-ভাবে সাংসারিক কথা আলোচনা করিত। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া গিরিশ পঞ্চমীর দিন কয়টা তাঁহার নিকটে আহার করিয়াছেন। আজ তাঁহাকে বলা হয় নাই। জমীদারে জমীদারে লাঠালাঠি—মকদ্দমা, সে ত হইয়াই থাকে—তাহাতে মা-ছেলের সম্পর্ক কি টুটিয়া যায়? প্রবীণা রমণী বালিকার মত অধীর হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন — তারপর আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, 'বাবা গিরিশ, আমি ভাবিয়াছিলাম তুমি এবার আসিবে না; যখন মনে করে খুড়িমার কাছে এসেছ, দু'টি ভাত মুখে দিয়া যাও। এখনি কর্ত্তা খাইয়া গিয়াছেন, দেরী হ'বে না, সব তৈরী আছে।"

আহার শেষ হইল। আমন-রস

প্রক্ষালনের পর, চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে খুড়িমার চরণে গিরিশবাবু পুনরায় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। চৌধুরী-গৃহিণী বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বলিলেন 'বাবা গিরিশ, আশীর্ব্বাদ করি যেন জয়ী হইয়া ফিরিও। আমি যদি সতী হই, তুমি জয়ী হইয়া ফিরিবে।

সতীর কথা মিথ্যা হয় নাই। গিরিশবাবু জয়ী হইয়া ফিরিলেন। বৃদ্ধ চৌধুরী আদালত হইতে বাহির হইবার সময় বলিলেন, "বুড়াকে দু'বার হারালি—চরে হার আবার আদালতে হার"। গিরিশ রায় বলিলেন, "খুড়িমার আশীর্ব্বাদ! এ রকম * * * * ব্যাপারে ছেলেরই জিত হইয়া থাকে"।

সে লালসিং ভোলাসিংএর দল চিরকালের মত চলিয়া গিয়াছে; সে চৌধুরীবাড়ী আর নাই। যে ফটক দিয়া গিরিশ রায় অভিমান-ভরা ক্ষুব্ধচিত্তে অন্দর-অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা সে বৎসরের ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। আছে কেবল সেই অষ্টভুজার মন্দির, যাহা গিরিশ রায় মাতৃ-স্বরূপা চৌধুরী-গৃহিণীর নামে বহুসমারোহে স্থাপন করিয়াছিলেন; আর আছে সেই বিশাল জাহ্নবী-চর যাহার বালুকাময় হৃদয় আজ শ্যামবৃক্ষ-শ্রেণী ও অট্টালিকায় ঢাকিয়া গিয়াছে। সে দিনকার চর আজ একটী গণ্ড গ্রাম—আর তাহার উপসত্বে মন্দিরের সেবা ও কার্য্য চলিয়া যাইতেছে;—কারণ, সে ত' গিরিশ রায়ের কৃত দেবোত্তর।

শ্মশানে সধবা।

মৃত্যু-২৩শে চৈত্র ১৩২৭। দিবা দ্বিপ্রহর, শুভ বারুণী যোগ।

কে তুমি শ্মশানে আজ এয়োস্ত্রী রমণী,
হিন্দু-কুল-গৃহলক্ষ্মি পুণ্যবতি নারি?
সীমন্তে সিন্দূর-ছটা, অলক্ত-রঞ্জিত
চরণ-দু'খানি তব; গলে পুষ্পমালা;—
কুসুম বিস্তৃত হেরি চারি পাশে তব;—
সাজিয়াছ কি সুন্দর কুসুমের রাণী!
পরিয়া নূতন বস্ত্র হাসি হাসি মুখ,—
সতীর কিরণ-জ্যোতিঃ শোভিছে বদনে!—
কত সাধু হেথা আজ এ শ্মশান-ভূমে
লইতেছে পদরজঃ তোমার আনন্দে;
ডাকিতেছে 'মা মা' বলি তোমা উচ্চস্বরে;
কেহ বা পূজিছে তোমা অতিসমাদরে!
হেরিয়া স্মৃতির পটে গুণগ্রাম তব,
ওই যে আত্মীয় কত বিষাদ-অন্তরে
ফেলিছে শোকাশ্রু আজ বিনত-বদন!—
তোমার বিয়োগ হৃদি ব্যথিছে তাদের!
ধন্য তুমি এয়োরাণী সধবা রমণী!
তোমার পরশে ধন্য এ শ্মশান-ভূমি।
তোমার বাঞ্ছিত সদা হরিনাম আজ
গাহিছে বৈষ্ণববৃন্দ মনের হরষে!
কে তুমি, কহ গো দেবি, এসেছিলে হেথা!
এই নিম্ন নরলোকে কিছু দিন তরে—
খেলিয়া সাধের খেলা খেলাঘর পাতি,
পুত্র পৌত্র সবে রাখি স্বামীর সহিত,
আবার চলিলে কি সে অনন্ত আবাসে?
ছিন্ন করি মায়া-রজ্জু সংসার-বন্ধন,
সগৌরবে চলি গেলা ফেলিয়া সবায়।
ধন্য তুমি পুণ্যবতী এয়োস্ত্রী রমণী!

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

পুস্তক-সমালোচনা।

১। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "শিক্ষাসমাস্যা ও কৃষিশিক্ষা" আমরা আগ্রহ অতি আগ্রহ-সহকারে পাঠ করিয়াছি। এইরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় যত অধিক প্রচারিত হয়, ততই মঙ্গল। আমেরিকা এবং য়ুরোপীয় অন্যান্য সভ্যদেশে শিক্ষাসংক্রান্ত পুস্তক দিন দিন এত বৃদ্ধি পাইতেছে, শিক্ষাবিষয়ক সাময়িক পত্রের অহরহঃ এত আবির্ভাব হইতেছে যে,শিক্ষালোচনা ইতোমধ্যেই সাহিত্যের এক বিশেষ অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা-সাহিত্যে শিক্ষা-বিষয়ক গ্রন্থের বড়ই অভাব। এই অভাব দূর করিতে প্রয়াস পাইয়া ক্ষিতীন্দ্রনাথ আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

ক্ষিতীন্দ্রবাবুর শিক্ষালোচনার মূলসূত্রগুলির সম্বন্ধে আমাদের কোন মতভেদ নাই। শৈশবশিক্ষা, বাল্যশিক্ষা, যৌবনশিক্ষা, প্রৌঢ়-শিক্ষা, প্রত্যেক অবস্থাতেই শারীরিক ব্যায়াম অতীব প্রয়োজনীয়। জাপান ও আমেরিকায় শিক্ষার প্রত্যেক স্তরেই শারীরিক ব্যায়াম অবশ্য-গ্রহণীয়। আমাদের দেশেও বহু পূর্ব্বেই ইহার প্রবর্ত্তন হওয়া উচিত ছিল। তাহার পর, ধর্ম্মশিক্ষা। জাপানে ধর্ম্মশিক্ষার কোনও ব্যবস্থা না থাকিলেও প্রতিবিদ্যালয়েই নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া নীতিশিক্ষার প্রচলন বোধ হয়, করা যাইতে পারে।

"জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি ভগবানে"—ধর্ম্মকে যদি এরূপ উদারভাবে গ্রহণ করা যায়, তবে এরূপ ধর্ম্মশিক্ষা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই, বোধ হয়, গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে। কাজেই নীতিশিক্ষা এই ধর্ম্ম-ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া ভারতে বেশ প্রচারিত হইতে পারে বলিয়া ক্ষিতীন্দ্রবাবুর ন্যায় আমাদেরও বিশ্বাস।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতিকে নীচ কর্ম্ম মনে করিয়া লোকে যাহাতে ঘৃণার চক্ষে না দেখে, সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সোপানে এইরূপ শিক্ষার সাধারণ ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের মতে শৈশব শিক্ষার অন্তে শিক্ষার দুইটি ধারা থাকা উচিত। যাহাদের উচ্চ শিক্ষালাভের সুযোগ ও সুবিধা হইবে না, যাহাদিগকে শীঘ্রই উপার্জ্জনক্ষম হইতে হইবে, তাহাদের জন্য কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবসায়-গত শিক্ষা প্রদানের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সাধারণ বিদ্যালয়ে সুপ্রণালী-বদ্ধ ব্যবসায়-গত শিক্ষা-প্রদানের সুব্যবস্থা হইতে পারে না; তাই আমেরিকা ও জাপানেও এইরূপ সরকারী বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ-দিকে আমাদের দেশের জনসাধারণের ও রাজপুরুষগণের আশু দৃষ্টি পাত করা উচিত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গ্রন্থকার কৃষিকার্য্য-সম্বন্ধে কৃষক-রমণীদিগের সহায়তার যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা অতি মূল্যবান্।

তিনি বলেন—"কৃষিকর্ম্মকে লাভজনক করিতে চাহিলে, তাহাতে সপরিবারে লাগিতে হইবে, নচেৎ শৃঙ্খলার অভাব হইবে। পরিবারের মধ্যে যে যে-কার্য্যের উপযুক্ত, তাহার সেই কার্য্যের ভার লইয়া সুশৃঙ্খলে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। যেন মুহূর্ত্ত সময়ও অপব্যবহারে নষ্ট না হয়। কৃষকপত্নী তো লাঙ্গল ধরিয়া চাষ করিতে পারিবেন না; কিন্তু তাই বলিয়া কৃষক যখন বাহিরে লাঙ্গল দেওয়াইতেছে, কৃষকপত্নী কি সেই সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন? তাহা নহে, শৃঙ্খলার বলে তিনিও সেই সময় বাটীর অভ্যন্তরে গো-পালন, ঘুঁটিয়া প্রস্তুত, পশু-পক্ষি-পালন প্রভৃতি নানাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন এবং পুত্র কন্যাদিগের মধ্যেও কতকগুলি কর্ম্মের যথোপযুক্ত বিভাগ করিয়া দিতে পারেন। তাহার ফলে, তাহারা ঐ সকল কার্য্যে সুশিক্ষিত ত হইয়া উঠিবেই; আবার তাহাদের শ্রমের ফলে যেটুকু লাভ হইবে, তাহাতে তাহাদের অন্ততঃ মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা তো অনায়াসে হইতে পারে। নিজের রোজগারে নিজের ভরণ-পোষণ হইতেছে, এটা বুঝিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাহাদের আত্মমর্য্যাদা অভিব্যক্ত হইবে।"

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 699. November, 1921.

"কন্যাপেব্যং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশ চন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৯ বর্ষ।	কার্ত্তিক, ১৩২৮। নবেম্বর, ১৯২১।	১২শ কল্প।
৬৯৯ সংখ্যা।		২য় ভাগ।

বিশ্ব-প্রীতি।

(মিশ্র পূরবী)

আহা! এই হাওয়াতে প্রাণে আমার
কি গান গায়!
গোপনে মোর মরম-মাঝে
কি শুনায়!
এই যে শ্যামল তৃণের রাশি
কি যে আমি ভালবাসি!
আহা! কাঁচা-সবুজ এমন হাসি
কে জাগায়!
ওগো মোহন, ওগো মধুর
এই তুমি—
রয়েছ এই ভুবন, দেহ
মন চুমি'!

ফুলে ফুলে সন্ধ্যাকাশে,
রবি তারায় শশীর হাসে,
আহা! স্থলে জলে রূপ বিকাশে
কি শোভায়!
আমি যে আর পারি নে গো,
দে-গো আমায় ডুবিয়ে দে গো,
রাঙিয়ে দে মোর হিয়া-কায়া
ঐ আভায়!
নিখিল সনে মধুর হব,
পাব বঁধুর পরশ নব,
ভাসিয়ে দেব তরী হঠাৎ
অজানায়!

শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল।

শিশুর শিক্ষা। *

শিশুর শিক্ষা ও পেষ্টালট্‌সি।

(১৭৪৬—১৮২৭)

য়ুরোপীয় শিক্ষার ইতিহাসে পেষ্টালট্‌সির (Pestalozzi) প্রভূত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর শিক্ষাকে একটি বিশেষ বিজ্ঞানরূপে গঠন করিয়া তুলিতে যে-সকল মনীষী চেষ্টা করিয়াছেন, পেষ্টালট্‌সি তাঁহাদের পিতামহ। মানসিক বৃত্তির বিকাশ- ও উন্মেষ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞান যে-সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছে, শিক্ষাক্ষেত্রে সে-গুলিকে প্রয়োগ করিবার জন্য বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে পেষ্টালট্‌সি এই পথ প্রদর্শন করেন। তাঁহার আরব্ধ কার্য্যের পরিসমাপ্তির ভার যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে ফ্রোবেল (Froebel), হার্ব্বার্ট (Herbart) ও হোরেস্ ম্যান (Horace Mann) সর্ব্বপ্রধান। পেষ্টালট্‌সি শিশুর শিক্ষার বিষয়- ও প্রণালী-সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, এখানে শুধু তাহাই বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।—

যখন তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন য়ুরোপের কোনও কোনও স্থানে শিশু-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাতে অনেক দোষ ও ত্রুটি ছিল। সেই সকল বিদ্যালয়ে শিশুদিগের মনোবৃত্তি-বিকাশের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না। "ধর্ম্মশিক্ষা" "ধর্ম্মশিক্ষা" করিয়া লোকগুলি এত উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, যে প্রত্যেক পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গেই তাহারা 'বাইবেলের' মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিত। যদি 'ফুল'-সম্বন্ধে কোনও পাঠ প্রদান করিতে হইত, তবে বাইবেলের যেখানে লিখিত আছে যে 'মানুষ ফুলের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়া, আবার ঝরিয়া পড়ে', সে স্থলের উল্লেখ করিতে হইত; ইত্যাদি। ছাত্রেরা অর্থ বুঝুক্ বা না বুঝুক্, কার্য্য করুক্ বা না করুক্, বাইবেলের কথা মুখস্থ করিতে পারিলেই তাহাদের ধর্ম্মলাভ হইল—এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের তাহারা বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিল।

যেখানে বৈষয়িক শিক্ষার প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হইত, সেই বিদ্যালয়েও "অকালপক্ব শিশু" প্রস্তুত করিবার দিকেই লোকের ঝোঁক ছিল। যখন বিদ্যালয়ে পরিদর্শক উপস্থিত হইতেন, তখন শিক্ষকগণ তাঁহাদের সেই "অতি-বুদ্ধি শিশুর" অলৌকিকী শক্তি দেখাইয়া পরিদর্শকের মনে বিস্ময় উৎপাদনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেন। ইহার বিষময় ফল এই হইত যে, সেই শিশুগুলির মধ্যে দিন দিন অহঙ্কারের ভাব প্রবল হইয়া উঠিত। পক্ষান্তরে অন্যান্য শিশুগণের মধ্যে সংশয় ও সন্দেহের ভাব উদিত হইয়া তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিত। এইরূপে অধিকাংশ শিশুই নিরুৎসাহ, নিরাশ ও ভগ্ন-হৃদয় হইয়া শিক্ষার প্রতি আগ্রহহীন হইয়া পড়িত।

* 'শিশু-শিক্ষার পথপ্রদর্শক'-শীর্ষক যে প্রবন্ধ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে, ইহা তাহারই অনুবৃত্তি।

ভ্রমের ভিতর দিয়াই ভ্রম-নিয়মনের শক্তি অর্জ্জিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের দোষ-ত্রুটি দর্শন করিয়া শিশুশিক্ষা-প্রচারের পক্ষপাতী ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ ভবিষ্যতে উক্ত শিক্ষাকে দোষ-ত্রুটীহীন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।—কিরূপ নীতি, কিরূপ প্রণালী, কিরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহারা কৃতকার্য্যতা-লাভে সমর্থ হইবেন, তাহার আভাস বা সন্ধান তাঁহারা তথা হইতে পাইয়াছিলেন।

তৎকালীন শিশু-বিদ্যালয়গুলির পক্ষে এ-কথা বলা যাইতে পারে যে, তথায় দয়া মায়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তির উন্মেষসাধন ও নৈতিক জীবন-গঠনের প্রচেষ্টা ছিল। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদেরও একটু ব্যবস্থা ছিল। একটি শব্দেরও অর্থ না বুঝিয়া ল্যাটিন ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করিয়া কারিয়া বালকগণ উচ্চতর বিদ্যালয়ে যেরূপ সময় নষ্ট করিত, এই সকল শিশু-বিদ্যালয়ে অন্ততঃ সেইরূপটি হইত না। তথাপি শিশু-বিদ্যালয়গুলি বালক-বিদ্যালয়ের অবিকল নকল বা প্রতিরূপ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। অধিকবয়স্ক বালকদিগকে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট পাঠ প্রদান করিয়াই শিক্ষকগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্যের সমাধান করিতেন,—শুধু তাহাদের মনে জ্ঞানরাশি ঢালিয়া দিয়াই তাঁহারা যেরূপ সন্তুষ্ট হইতেন, শিশু-বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও শিক্ষা-প্রদানকালে শিশুদের কোমল বয়স বা কোমল মস্তিষ্ক কথা না ভাবিয়া, সেই উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীই অন্ধের ন্যায় অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। "শিশু-শিক্ষার" যে নব আদর্শ ও প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া পেষ্টালট্‌সি ও তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য ফ্রোবেল শিক্ষাক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছিলেন, উহার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা তখনও য়ুরোপ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় নাই।

পেষ্টালট্‌সির শিক্ষানীতি ও শিক্ষাপ্রণালী মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী শিক্ষা-সংস্কারকগণ তদুপরি সুশোভন শিক্ষা-সৌধ নির্ম্মাণের প্রয়াস পাইয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার শিক্ষার আদর্শ অতি উচ্চ ও মহান্; এবং সেই উন্নত আদর্শে পৌঁছিবার যে সোপানাবলী তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও অতি প্রকৃষ্ট। তিনি বলেন—"মানব-হৃদয়ে ভগবান্ যে-সকল বৃত্তি নিহিত করিয়াছেন, অবাধ-ব্যবহার-দ্বারা তাহাদের পূর্ণ বিকাশ-সাধনই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। মানব যে অবস্থাতেই থাকুক্ না কেন, সে তাহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের যন্ত্র-স্বরূপ জ্ঞান করিবে এবং স্বকীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে ভগবদ্দত্ত শক্তির যথাযথ প্রয়োগ করিয়া জীবনের পূর্ণ পরিণতি-লাভে সচেষ্ট হইবে। যে শিক্ষা মানবকে এই গুরুকর্ত্তব্য-সাধনের উপযুক্ত করিয়া তুলে তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।" সুতরাং শুধু জ্ঞানদান বিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, বিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য—শিশুর হৃদয়নিহিত ভগবদ্দত্ত শক্তির উন্মেষ-সাধন। উচ্চ-নীচ, ধনি-দরিদ্র, সকলের হৃদয়েই এই শক্তি নিহিত রহিয়াছে। সমাজের নিম্ন-স্তরের লোকগণও শিক্ষাগুণে তাহাদের সেই ভগবদ্দত্তশক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে পারে। তাই কৃষককুল যাহাতে সেই শক্তির সন্ধান পাইয়া উহার উন্মেষসাধনে যত্নপর হয়, তাহাই পেষ্টালট্‌সির জীবনে প্রধান ব্রত হইয়া উঠে, এবং এই ব্রত উদ্‌যাপনে তিনি স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন দিয়া সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন।

তাঁহার বিশ্বপ্রেম, তাঁহার স্নেহমমতা, তাঁহার কোমল-কঠোর শাসন শিশুদের হৃদয়ে প্রাণের স্পন্দন ও আশার তরঙ্গ তুলিয়া শিক্ষাকে সরস, সজীব ও প্রাণবান্ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

মনোবৃত্তির উন্মেষ-সাধন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য না হইলেও, উহা উদ্দেশ্য-লাভের উপায়ভূত শিক্ষার যে এক প্রধান অঙ্গ, এ-কথা তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই। তবে তিনি বলেন—লিখন, পঠন ও গণনা-শিক্ষা শিশুর পক্ষে তত প্রয়োজনীয় নয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পরিচালনা ও হৃদয়ের উন্মেষ বিধান করিয়া প্রকৃত মনুষ্য-পদবাচ্য হওয়া তাহার পক্ষে যত প্রয়োজনীয়। কাজেই শিশুকালে লেখাপড়ার দিকে সমস্ত মনোযোগ না রাখিয়া, শিশুর হস্তকৌশল ও বাক্-শক্তির চর্চ্চা-বিষয়ে পিতা মাতা ও শিক্ষকের যথোপযুক্ত যত্ন লওয়া উচিত। যে জ্ঞান কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহার মূল্য অতিশয় অল্প। সুতরাং বিদ্যালয়ে গৃহ-শিল্পশিক্ষাকে প্রধান স্থান প্রদান করিয়া মৌখিক-শিক্ষাকে দ্বিতীয় স্থান প্রদান করা উচিত। শিশুগণ যাহাতে লেখাপড়ার বাহ্যাড়ম্বরের মোহে মুগ্ধ না হইয়া, নিজ নিজ অবস্থা ও বয়সের উপযোগী কর্ম্মক্ষেত্রে শ্রম- ও ধৈর্য্য-সহকারে ধীর-স্থির-চিত্তে অগ্রসর হইতে পারে, এবং তাহাদের কোমল চিত্তে শিশুকাল হইতেই যাহাতে জীবে প্রেম ও ভগবানে ভক্তির সুমহান্ আদর্শ বদ্ধ-মূল হইতে পারে, তাহাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল।

তিনি সর্ব্বদা বলিতেন,—চিন্তাশক্তি ও কার্য্যকরী শক্তি জন্মিবার পূর্ব্বেই শিশুর হৃদয়ে স্নেহ, প্রীতি এবং বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মিয়া থাকে। "বৃক্ষের পক্ষে মূল যেরূপ শিশুর পক্ষে হৃদয়ের দুইটি গুণ—বিশ্বাস এবং ভক্তিও তদ্রূপ।" মূল ভিন্ন বৃক্ষের পক্ষে বর্দ্ধিত হওয়া যেরূপ অসম্ভব, হৃদয়ের বিকাশ ভিন্ন শিশুর অন্যান্য বৃত্তির উন্মেষ হওয়াও তদ্রূপ অসম্ভব। বস্তুতঃ, আমাদের হৃদয় নিহিত কোমল ভাব—স্নেহ, প্রীতি, দয়া মায়া, বিশ্বাস, ভক্তি প্রভৃতিই আমাদিগকে ন্যায় ও সত্যের পথে চালিত করে; আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি অনেক সময় আমাদিগকে বিপথে লইয়া যায়। সুতরাং ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় সকল বিষয়ের মধ্যে অগ্রগণ্য। প্রত্যেক শিশুকে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা করিতে হইবে যে, কিরূপে সরল প্রাণে বিশ্বাস-ভক্তি-সহকারে ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিতে হয়। কাজেই এক কথায় বলিতে গেলে, পেষ্টালট্‌সির মতে আদ্য শিক্ষার উদ্দেশ্য—শিশুকে প্রার্থনা, চিন্তা, ও কার্য্য করিতে শিক্ষা দেওয়া (—to pray, to think and to work)।

হৃদয়ের বৃত্তির পরিচালনা এবং মস্তিষ্কের পরিচালনার ন্যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালনাও আবশ্যক। শিশু নীচবংশে শ্রমজীবীর ঘরেই জন্মগ্রহণ করুক, বা উচ্চবংশে সম্ভ্রান্ত পরিবারেই জন্মগ্রহণ করুক, তাহার শরীর-চালনা প্রয়োজনীয়। সুতরাং, বিদ্যালয়ে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, সকল শিশুকেই যেন কোন না কোনরূপ হাতের কাজ শিক্ষা করিতে হয়। ইহাতে শ্রমশীলতা ও আত্মশক্তির উন্মেষ হয়, অহঙ্কার বিদূরিত হইয়া আত্মসম্মান-বোধ জাগরিত হয় এবং ভবিষ্যৎকালের কর্ম্মময় জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হইয়া থাকে।

শিশুদিগকে যে শিক্ষাই প্রদান করা হউক না কেন, তাহা সরল, সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। সুতরাং শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার প্রথম ও প্রধান বিষয় ঠিক্‌ভাবে দেখিতে ও শুনিতে শিক্ষা দেওয়া এবং মনঃসংযোগ করিবার অভ্যাস গঠন করিয়া দেওয়া। তাই পেষ্টালট্‌সির প্রধান শিক্ষা-মত এই যে, শিশুগণ যাহা নিজে নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে, সেই সকল পদার্থ লইয়া শিশুদের শিক্ষা আরম্ভ হইবে; তিনি বলেন—"শিশুদের ইন্দ্রিয়ের উপর সাধারণতঃ যাহা অভিনবভাবে আঘাত করে, সেই সকল পদার্থের প্রতিই আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি। শিশু সর্ব্বপ্রথম কখন্ শিক্ষালাভের শক্তি অর্জ্জন করে, এ-বিষয়ে আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জন্ম হইতেই শিশুগণ শিক্ষালাভের শক্তি অর্জ্জন করিয়া থাকে। যেই মুহূর্ত্তে শিশুর ইন্দ্রিয় বাহ্য জগতের সংস্পর্শে আসে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে প্রকৃতিদেবী তাহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। যে জীবনীশক্তি এতদিন সুপ্ত ছিল, তাহা এখন জাগ্রৎ হয়; তাহা এখন নব নব অনুভূতিকে গ্রহণ করিবার শক্তি লাভ করে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ শক্তির যথোচিত পরিচালনা করিয়া তাহাদের আধার-ভূত যে প্রাণবান্ যন্ত্র বা জীব তাহার পরিপুষ্টি ও উন্নয়নের সহায়তা করিয়া তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিবার সমস্ত আয়োজন পূর্ণ করিয়া তুলে। সুতরাং, শিক্ষকদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তির যথোপযুক্ত বিকাশের পথে সহজ- ও সরল-ভাবে সহায়তা প্রদান করা এবং তাহার বয়সের ও শক্তির তারতম্যানুসারে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থসমূহ তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত করা।"

তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীর বর্ণনা কালে তিনি এই বলিয়া আরম্ভ করেন—"আমি শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে চাই।" সমস্ত শিক্ষাকে তিনি "Anschauung" *—এই মূল ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন। মনের যে শক্তির প্রভাবে মানব অপরের সাহায্য ভিন্ন অনায়াসে ও নিঃসংশয়িত-রূপে বাস্তব-জগৎ-সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে, তাহাকেই "Anschauung" বলা যাইতে পারে। মুহূর্ত্তমধ্যে কোনও বস্তু- বা ব্যক্তি-সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই "Anschauung।" ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর সম্বন্ধে ধারণা ও ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়-সম্বন্ধে উপলব্ধি—এই দুই-ই ইহার অন্তর্গত। সুতরাং প্রকার-ভেদে ইহাকে তিন শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে:—ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি (Sensuous), বুদ্ধি-প্রসূত উপলব্ধি (intellectual), এবং বিবেক-জাত জ্ঞান (moral)। অথবা ইহাকে মোটামুটি দুই প্রকারের বলা যাইতে পারে:—বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অনুভূতি বা অন্তরেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য উপলব্ধি। অন্তরেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য উপলব্ধিকে আবার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে:—সত্যের জ্ঞান, সৌন্দর্য্যের জ্ঞান, মঙ্গলের জ্ঞান, এবং অসীমের জ্ঞান, এক কথায় সত্য, শিব, সুন্দর ও অসীমের জ্ঞান।

জ্ঞানই শিক্ষার মূলে নিহিত। কিন্তু

* এই জার্ম্মান শব্দটি যে অর্থ প্রকাশ করে, তাহার উপযুক্ত প্রতিশব্দ এখনও ইংরাজী ভাষায় আবিষ্কৃত হয় নাই। কেহ কেহ ইহাকে ইংরাজীতে "Sense-impression," কেহ কেহ ইহাকে "Observation," কেহ কেহ বা "Intuition" বলিতে চান।

(Locke) পেষ্টালট্‌সির প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে জ্ঞান মনোরূপ অন্তরেন্দ্রিয়ের অনুভূতিমাত্র (Knowledge is the internal preception of the mind)। উপলব্ধি ভিন্ন জ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু এই শক্তি শিশুদের নাই,—শিশুরা এইরূপ জ্ঞানলাভে অসমর্থ।—ইহাই লকের অভিমত ছিল বলিয়া মনে হয়। তাঁহার পরবর্ত্তী শিক্ষাসংস্কারক রুসোও (Rousseau) বার বৎসর পর্য্যন্ত বালকের কোনওরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা পছন্দ করেন নাই। কিন্তু পেষ্টালট্‌সি বলিলেন যে, প্রত্যেক শিশু জন্ম মুহূর্ত্ত হইতে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে শিক্ষালাভ করিতে আরম্ভ করে। শিশু কি ভাবে শিক্ষা করে? অপরের মনের চিন্তা বা ভাব বা অভিজ্ঞতা-ব্যঞ্জক বাক্য আবৃত্তি করিয়া নয়, কিন্তু নিজের ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে, নিজের চিন্তাশক্তির প্রভাবে, নিজের ভাব-প্রবণতার (Feelings) গুণে সে শিক্ষালাভ করিতে থাকে।

সুতরাং, মনোবৃত্তির উন্মেষের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, আদ্য শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধন। পেষ্টালট্‌সির মতে শিশুর এই চিন্তাশক্তি-বিকাশের প্রধান অবলম্বন — তাহার পরিপার্শ্বিক অবস্থা, তাহার জীবনের বাস্তবরাজ্য যাহা তাহার হৃদয়ে কৌতূহল, আগ্রহ, আমোদ প্রভৃতি ভাব জাগাইয়া তুলে। এক কথায়, যাহা হইতে তাহার প্রাণে স্পন্দন অনুভূত হয়, এইরূপ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ইতস্ততঃ পরিদৃশ্যমান পদার্থসমূহ। শিক্ষকের প্রধান কর্ত্তব্য— শুধু শিশুর সম্মুখে উপযুক্ত পদার্থ উপস্থাপিত করা ও সেই সকল পদার্থ পর্য্যবেক্ষণ করিবার যথোপযুক্ত সুযোগ শিশুকে প্রদান করা এবং পর্য্যবেক্ষণ-কালে স্নেহপূর্ণ অন্তরে শিশুর কার্য্যের তত্ত্বাবধান করা ও তাহাকে কিছু কিছু সাহায্য করা। এইরূপে শিশুগণ যে জ্ঞান অর্জ্জন করে, তাহাই তাহাদের প্রকৃত জ্ঞান; কারণ, এই জ্ঞান তাহারা নিজের বাহ্যেন্দ্রিয় ও নিজের অন্তরেন্দ্রিয়ের সাহায্যে নিরপেক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে লাভ করিয়াছে।

যাহা হউক, এই জ্ঞানার্জ্জন-ব্যাপারে জননী শিশুকে যেরূপ সাহায্য করিতে পারেন, এ পৃথিবীতে অপর কেহ তদ্রূপ পারেন কি-না সন্দেহ। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী শিক্ষিত হইলেও তাঁহারা মায়ের হৃদয়ের স্নেহ-কোমলতা হইতে বঞ্চিত। অথচ মানবশিশুর শিক্ষার প্রথম অবস্থায় সদয় ব্যবহার, সস্নেহ যত্ন, সকরুণ দৃষ্টি ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার যত প্রয়োজন, আর কিছুরই তত আবশ্যকতা নাই। পেষ্টালট্‌সির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এইরূপ শিক্ষাকার্য্য জননীগণের হস্তে ন্যস্ত থাকিলে যেরূপ সুফলের আশা করা যায়, শিক্ষকের হস্তে তাহা অর্পিত থাকিলে সেরূপ সুফলের আশা দুরাশামাত্র। তাই শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে জন-সাধারণের সহানুভূতি ও অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া তিনি যে আবেদন-পত্র প্রচার করেন, তাহাতে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন যে, ভবিষ্যদ্ বংশধরগণ যাহাতে তাহাদের জননীর নিকট হইতে মানসিক উৎকর্ষবিধানের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেইদিকে স্থির লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

পেষ্টালট্‌সি শিশু-জননীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"শিশুজীবনের বিকাশকার্য্যে

সর্ব্বপ্রধান সহায়ক হইবার উপযুক্ত সমস্ত গুণ দিয়া ভগবান্ মাতৃহৃদয় গঠন করিয়াছেন্। জননীর নিকট হইতে এরূপ আশা করা অতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক হইবে না যে, তিনি সেহান্ধ না হইয়া একটু সুবিবেচনার সহিত তাঁহার সন্তানকে ভালবাসিতে অভ্যাস করিবেন্।···ভগবান্ শিশুকে মানব-প্রকৃতির সমস্ত বৃত্তিই দান করিয়াছেন ; কিন্তু সর্ব্বপ্রধান বিষয় এখনও অমীমাংসিতই রহিয়া গিয়াছে। কিরূপে উহার চিত্তবৃত্তি (heart), উহার বুদ্ধিবৃত্তি (head) ও উহার কর্ম্মশক্তির (hand) চালনা করিতে হইবে, তাহা এখনও একটি প্রধান শিক্ষা-সমস্যাই আছে। কাহার সেবায় তাহার দেহ-মনঃ-প্রাণ উৎসর্গীকৃত হইবে, তাহা এখনও রহস্যের গূঢ় জালেই আচ্ছন্ন রহিয়াছে। হে শিশু-জননি! তোমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় সন্তানের ভবিষ্যৎ সুখদুঃখ এই প্রশ্নের সুমীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে। তোমার সন্তানের সম্মুখে স্বর্গারোহণের সোপানাবলী উন্মুক্ত রহিয়াছে। সেই সোপানাবলীর সাহায্যে কিরূপে স্বর্গে আরোহণ করিতে হইবে তাহাই শুধু তোমাকে শিক্ষা দিতে হইবে। সাবধান। তোমার সন্তান যেন শুধু মস্তিষ্কের অসার শক্তির সাহায্য অথবা শুধু হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময় ভাবতরঙ্গের সহায়তায় সেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে চেষ্টা না করে। শরীর মন ও হৃদয়ের সমস্ত শক্তি ও বৃত্তিগুলিকে একীকৃত, সমঞ্জসীভূত ও পূর্ণ-বিকশিত করিতে চেষ্টা কর, তোমার সন্তানের ভবিষ্যৎ গৌরব-মণ্ডিত, মহিমময় ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।”

সন্তান-বৎসল শিক্ষিত বঙ্গজননীগণ! তোমাদের সম্মুখে প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। সন্তানের প্রথম শিক্ষার ভার তোমাদিগকে নিজ-হস্তে গ্রহণ করিতে হইবে। উদার শিক্ষার অভাবেই তোমাদের সন্তানগণের হৃদয় সম্প্রসারিত হইতে পারিতেছে না। তাই সে-দিন বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচনাধিকার-ব্যাপারে তোমাদিগকে এতদূর লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হইল। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থ বলিয়াছেন—‘সমাজের নিকট ব্যক্তির—নিয়মের ও শিক্ষার শাসন-দ্বারা চির দাসত্বের ও বলপূর্ব্বক আত্ম-বিসর্জ্জনের কি ফল ও পরিণাম আমাদের মাতৃভূমি তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত।’ আমরা ভুলিয়া যাই যে, “সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে-বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজের সেইদিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ। যে-সকল সামাজিক নিয়মে এই স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর ও যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয়, তাহার করা উচিত।” অতএব যে শিক্ষায় ‘মনোবৃত্তির স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, আশার তরঙ্গ নাই, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই, তীব্র সহানুভূতি নাই, বিকট দুঃখেরও স্পর্শ নাই, উদ্ভাবনী শক্তির উদ্দীপনা একেবারেই নাই, নূতনত্বের ইচ্ছা নাই,’ সেই শিক্ষার মূলোৎপাটন করিয়া, হে বঙ্গজননীগণ, তৎস্থলে সন্তানের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত কর। যে শিক্ষায় ‘হৃদয়ের মেঘ কখনও কাটে না, এ-অবস্থা অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট আছে কি-না মনেও আসে না, আসিলেও বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইলেও উদ্যোগ হয় না, উদ্যোগ হইলেও উৎ-

সাহের অভাবে তাহা মনেই বিলীন হইয়া যায়, সেই শিক্ষার বিনাশ সাধন করিয়া সন্তানের উদার ও উন্নত শিক্ষার আয়োজন কর। দেখিবে অচিরে নারীর মর্যাদা ফিরিয়া আসিবে, সমাজের মুখ হইতে কলঙ্ক-কালিমা অপসৃত হইবে এবং ভারতের মুখ পুনরায় উজ্জ্বল হইবে। তাই পেষ্টালট্‌সির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

"Then why resign into a stranger's hand
A task as much within your own command,
That God and Nature and feeling too
Seem with one voice to delegate to you ?"

[অর্থাৎ— বিধাতা, প্রকৃতি আর অন্তরের যাহা
সমস্বরে সাধিবারে ডাকিছে তোমায়
যে-কার্য্য সাধিতে তুমি নিজেই সবল,
পর হস্তে কেন তবে তুলি দাও তাহা ?]

শ্রীযোগেশ চন্দ্র দত্ত।

বিসর্জ্জনী।

নন্দন আনন্দ-আভা ছড়াইয়ে দিয়ে,
দাঁড়াইলে মা আমার কুটীরে আসিয়ে।
আজি বিদায়ের দিন, হাসি, আলো, বর্ণহীন,
নিবিড় তিমির শুধু চমকে ঘনিয়ে।

প্রাণ করে হাহাকার! যাবে তুমি দূরে—!
ভুলে যাই, যথা রহ দুরাশুর পুরে,—
অশ্রু বাষ্প বাহি স্মৃতি পহুঁছিবে পদে নিতি—
ভকতের মনোরক্ত জবা ডালি নিয়ে।

রচনা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা।

স্বরলিপি।

মিশ্র ললিত * ——একতালা।

০ ১ ২ ৩
II । ন্া -ঋা ঋা । মা মা -া I মমা মজ্ঞা -মা । মা গা -া ।
ন ন্ দ ন আ ॰ নন্ দ ॰ ॰ আ ভা ॰

০ ১ ২ ৩
। মা গা -া । মা পা -দা I দা পা -া । -মা -গা -া ।
ছ ড়া ॰ ই য়ে ॰ দি য়ে ॰ ॰ ॰ ॰

০ ১ ২ ৩
। মা পা মা । পা -দা -া I পা -দা পা । পা - -া
দাঁ ড়া ই লে ॰ ॰ মা ॰ আ মা ॰ র

---

* ললিত, ভৈরবী এবং বিভাস মিশ্রিত।

০ ১ ২´ ৩
। মা গা মা। ধা -া -া I পা ধা -পা। মা মা -গা } ।
প র্ ছি বে ০ ০ প দে ০ নি তি ০

০ ১ ২´ ৩
। পা ধা র্সা। র্সা -া -া I না র্সা -না। -দা -পা -া ।
ভ ক ত্তে র ০ ০ স নো ০ ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
। মা -ণণা দা। পা -মা -গা I মা পা মা। গা -ঋা -সা II II
য ত্নত০ জ বা ০ ০ ডা লি নি য়ে ০ ০

স্মৃতিহারা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৪)

অল্পদিন পরে কোহিনুরের একটি পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। সরোজা তাহার নাম দিলেন 'নবনুর'।

বিনোদ পুত্রের জন্মের সংবাদ পাইয়া আসিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন; কিন্তু সঙ্গীরা ছাড়িল না; বলিল, "ব্রহ্মদেশটা ভাল করে না দেখে যাচ্ছি না। ছেলে তো পালাচে না!—দু'দিন পরেই না হয় দেখ্‌বে।"

কোহিনুর এতদিন স্বামীর দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিত বটে; কিন্তু যে-দিন হইতে নবনুর তাহার কোল আলো করিল, সে-দিন হইতে প্রতিমুহূর্ত্তেই সে স্বামীর আগমনের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইতে লাগিল। তাহাদের দুই জনের কত সাধের কত আশার সন্তান! এই ভাবী অতিথির আগমন-সূচনায় দুইজনে কত মধুর কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছে, কত নিত্য নূতন সুখের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে! আজ সেই ধন তাহার কোলে আসিয়াছে। এ-সুখের ভার কি সে একা বহনে সমর্থ! এই হাসি শিশুর এই অফুরন্ত সৌন্দর্য্য,যাহা অহর্নিশ নেত্র দ্বারা পান করিয়াও দর্শনতৃষ্ণা মিটিতেছে না, সেই সৌন্দর্য্য সে কাহার নয়নে ঢালিয়া দিয়া বিভোর হইয়া দেখিবে! কবে কোহিনুর তাহাদের প্রতিচ্ছবি এই সন্তানকে সেই কোলে দিয়া জননীর গর্ব্বোৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া নিজের নারীজন্ম সার্থক করিবে! তাহার অন্তরের গুহ্যতম প্রদেশ হইতে নিরন্তর এই বাণী উত্থিত হইতে লাগিল—'এস প্রিয়, তোমার দাসীর এই অতিসুখের দিনে কি তোমার দূরে থাকা সাজে!'

কোহিনুর বিনোদকে পত্র লিখিল—"আমি না হয় তোমার অনাদরের হ'তে পারি, কিন্তু খোকা কি দোষ করল? তুমি আজও তা'কে দেখ্‌তে আস্‌লে না? সে খোকা ছেলে হয় তো এমন নিষ্ঠুরকে দেখেও হাস্‌বে; কিন্তু জেনে রেখ, আমি আর কথা কব না।"

ইহার উত্তরে বিনোদ হৃদয়ের আকুল আবেগ জানাইয়া পত্র দিল, কোহিনুরের কাছে শতবার মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল, সে যে তাহাদের দেখিবার জন্ত কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছে পত্রের ছত্রে ছত্রে বার বার করিয়া তাহা জানাইতে ভুলিল না।

বিনোদ দূরে থাকিয়াও রোজই জানিতে লাগিল, খোকা দিন দিন কেমন হইতেছে, কেমন হাসে, কখন্ কাঁদে, ইত্যাদি। খোকা যখন এক মাসের হইল, তখন পিতা ও পিতামহের নিকট তাহার হাস্তময় প্রতিবিম্ব গিয়া স্নেহ-চুম্বনের দাবি করিয়া দাঁড়াইল। বিনোদ এবার আর পরিল না ; সে গৃহ-পথ যাত্রী হইয়া পড়িল। কিন্তু এখানে আসিয়া পৌঁছিবামাত্র বিনোদ টেলিগ্রাম পাইল,—তাহার পিতা অত্যন্ত পীড়িত, তাহাকে অবিলম্বে তথায় যাইতে হইবে। সুতরাং শ্বশুরকে এই সংবাদ জানাইয়া বিনোদ কাশ্মীর চলিয়া গেল।

*　　　*　　　*　　　*

কার্ত্তিকের প্রথমে সরোজা বলিলেন, "কোহিনুর, একদিন গরম জামাগুলা বাহির করিয়া রোদে দে না মা ; ও-গুলা ভাল করে না ঝাড়া-ঝুড়া হ'লে তো গায়ে দেওয়া যাইবে না। আমার দ্বারা তো ও-সব হবার যো-ই নাই !"

গত পীড়ার পর হইতে সরোজার বুক অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সামান্ত পরিশ্রমেই তিনি হাঁপাইয়া পড়িতেন। ডাক্তার বলিয়া ছিলেন, হঠাৎ হার্টফেল হওয়ার সম্ভাবনা, সুতরাং তাঁকে যেন খুব সাবধানে রাখা হয়। মাতার আদেশ পাইয়া কোহিনুর বলিল, "তুমি খোকাকে দেখ মা, আমি সে-সব ঠিক করে রাখ্‌বো।"

এই সময় খোকা তাহার মায়ের গলার হার ধরিয়া টানিয়া খেলা করিতেছিল ; কোহিনুর বলিল, 'দেখ্‌চ মা, আমার হার কেড়ে নিচ্চে ? সরোজা বলিলেন, 'তাই তো, আমারই অন্যায় ! আমার এতদিন ওকে হার পরান উচিত ছিল তো। দাঁড়া, তোর ছোটবেলার হারছড়াটা আর বালাটা বের করে আনি !"

গহনার জন্ত সরোজা বাক্স খুলিলেন। গহনার বাক্স খুলিলেই সুশীলের ছবিখানি দেখা তাঁহার অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। সেই অভ্যাসানুসারে তিনি ছবিখানি দেখিতে গিয়া হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন—'ছবি কি হইল !' শেষে ধীরে ধীরে মনে হইল—"অসুখের সময় বিছানার তলায় রাখিয়া আর তো তুলি নাই !" তখন যে চাকর তাঁহার ঘরে কাজ করিত, তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার অসুখের সময় বিছানায় একখান ফটো ছিল, দেখেছিস্ ?"

সে কোহিনুরকে ছবিখানি লইতে দেখিয়াছিল ; বলিল, "দিদিমণি রেখেছেন !" সরোজা আত্ম-বিস্মৃত-প্রায় হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"দিদিমণি রেখেছে কি রে ! সে যে আমার সুশীলের ছবি !" সরোজার ভাব দেখিয়া ভৃত্য থতমত খাইয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। কোহিনুর পাশের ঘরেই ছিল, সরোজার কথা সবই তাহার কানে গিয়াছিল। সে সরোজার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ছবি খুঁজ্‌ছ মা ?" কিন্তু মায়ের মুখের চেহারা দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি ভৃত্যকে জল আনিতে বলিল ও নিজে পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল।

জল ও বাতাস দিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইলে কোহিনুর মাতাকে শয্যায় লইয়া শোয়াইয়া দিল। সরোজা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হা ভগবান্!" কোহিনুর জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কাছে ছবি রেখেছি, তাইত তুমি কেন এমন অধৈর্য্য হ'চ্চে মা? সুশীলের ছবি রয়েছে, তা আমার তা দেখ্‌লে কি হয়? তুমি আমায় কোন কথা বল না, কিন্তু এই সুশীলকে তা জান্‌বার জন্যে আমার মনে যে কি রকম একটা ধীং ধুক্‌ জাগে, তা তোমায় কি বল্‌বো! সুশীল বল্লেই যেন একটা কি-রকম গোলমেলে স্বপনের মত মনের মধ্যে তোলপাড় করে উঠে, অথচ আমি নিজে তার কোন মীমাংসা কর্‌তে পারি নে! তোমায় জিজ্ঞেস্ কর্‌তে ইচ্ছা করে, কিন্তু তুমি নাম শুন্‌লেই কি রকম হয়ে যাও! আমার ভারী আশ্চার্য্য মনে হয়!"

সরোজা কিছুক্ষণ কোহিনুরের মুখের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "কোহিনুর, তোর মা'র আর বেশীদিন আয়ু নেই; যে কথা তোকে নিজ হতে বলি নি, সে-কথা বল্‌তে বাধ্য করে তার প্রাণে আর ব্যথা দিস্ নে! কোথায় সে ছবি রেখেছিস্ এনে দে; আমি মরণ-কালে যদি পারি, বলে যাব সুশীল আমার কে।"

কোহিনুর রাগ করিয়া বলিল, "আমার শুন্‌বার কোন দরকার নেই; তোমায় ছবি এনে দিচ্চি।" কোহিনুর জননীর হাতে ছবি ফেলিয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সরোজা বিছানায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মণিমোহন আসিয়া সরোজার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সরোজা ফটো বাহির করিয়া বলিলেন, "কোহিনুরের কাছে ছিল। সে সুশীল কে জান্‌বার জন্তে ভারী ব্যস্ত হয়েছে। আমি বলি নি বলে সে রাগ করে আমার কাছ থেকে চলে গেছে।" মণিমোহন বলিলেন, "তোমারই অন্যায় হয়েছে। ও-রকম করে ওকে লুকুলে ওর মনে সন্দেহ আস্‌বে। যত তুমি গোপন করবে ততই ওর মনে ওই কথা তোলাপাড়া করবে; শেষে ভাব্‌তে ভাব্‌তে হঠাৎ হয় তো সব মনে পড়ে যেতে পারে। আমি আর পারি নে। আমি তাকে যা'হোক বুঝিয়ে দিচ্চি।"

মণিমোহন কক্ষান্তরে গিয়া কোহিনুরকে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখিলেন। তিনি তাহাকে তাহার মাতার কক্ষে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "মা, তুমি সুশীল কে জান্‌তে চেয়েছ? তোমার হতভাগ্য এই জনক-জননী পিতৃমাতৃহীন এই সুশীলকে পুত্রস্থানীয় করে প্রতিপালন করেছিলেন। কিন্তু হায়, সে আমাদের ফেলে চলে গেল! তুমি তখন অতিবালিকা। আমি তোমার মাকে বলে দিই, আমার বাড়ীতে যেন তার নাম, তার প্রসঙ্গ কেউ কখনো উত্থাপন না করে। তোমার মা কিন্তু তাঁর মনকে বিসর্জ্জন দিতে না পেরে মধ্যে মধ্যে লুকিয়ে তার ফটো নিয়ে কাঁদ্‌তেন।" মণিমোহনের কথা শেষ না হইতেই শোকোচ্ছ্বাস-হৃদয়া সরোজা চিৎকার করিয়া মূর্চ্ছা যাইলেন।

(১৫)

এবারেও সরোজার সুস্থ হইতে দিন-আট-দশ লাগিল। কোহিনুর এক দিন রুগ্না মাতা ও শিশু পুত্রকে লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সংসারের অন্য কাজের সময় ছিল

হয়। আটদশদিনের পরে আজ দুপুর বেলায় অবসর পাইয়া মায়ের কাছে সে খোকাকে রাখিয়া পুনরায় সেই গরম জামাগুলি সব রোদ্রে দিল।

পিতার জাম জামাগুলি রৌদ্র দিয়া ঝাড়িয়া সে তুলিতে যাইতেছে, হঠাৎ একটা জামার পকেট হইতে একখান টেলিগ্রামের খোলা খাম পড়িয়া গেল। কোহিনুর সেটা কুড়াইয়া লইয়া ভিতর হইতে কাগজখানা টানিয়া বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল; পড়িয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িল। একি! সে-ই যে তাহার পিতাকে ঢাক্কায় লইয়া যাইবার জন্ম টেলিগ্রাম করিয়াছে—তাহার স্বামী পীড়িত! কোহিনুর অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল, একি কাণ্ড! তাহার বিবাহিত জীবনের এই তো সবে দুই বৎসর—মাত্র দুইবৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এই দুইবৎসরের প্রত্যেক দিন প্রত্যেক মুহূর্ত তাহার অন্তরে কোদিত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে সে পিতাকে স্বামীর অসুখের জন্ম টেলিগ্রাম করিল কবে? কিন্তু করিয়াছে যে ইহাও সত্য। তবে এ টেলিগ্রাম বিক্রমপুর হইতে করা হইয়াছে। কোহিনুর বিক্রমপুরে কবে গেল! বিবাহের পর বিনোদের সহিত সে তো কাশ্মীর ছাড়া আর কোথাও যায় নাই! তবে একি প্রহেলিকা! কোহিনুর অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল; ভাবিল, তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিবে; কিন্তু গভীর-ভাবে ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাহার মনের যতদিনের রুদ্ধকপাট মুক্ত হইয়া গেল; দিগন্তে গগনের পূর্ব্বপ্রান্তে যেমন অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া অরুণ-রাগ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ বিস্মৃতির অন্ধকার-যবনিকা সজোরে অপসারিত করিয়া লুপ্ত পূর্ব্বস্মৃতি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে কোহিনুরের মনে রূপে প্রেমে উদ্ভাসিত হইয়া সুশীলের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল।

কোহিনুরের এতদিনের দারুণ উৎকণ্ঠার অবসানে সে জানিতে পারিল—সুশীল কে? তখন সে ভাবিতে লাগিল—ওঃ তাই সে-ছবি তাঁ'র এত প্রিয়! কিন্তু কোহিনুরেরও তো সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই একমাত্র আরাধ্য ছিল! তবে আজ একি পরিবর্ত্তন! কোন্ যাদুকরের কুহক-মন্ত্রে কোহিনুর তাহার জীবনাধিককে একেবারে বিস্মৃত হইয়া বসিয়া আছে! শুধু বিস্মৃত! কোহিনুর আজ বিনোদের স্ত্রী! নবকুমারের মা! তাহাদেরই স্নেহ-প্রেমে আত্মহারা!—কি সর্ব্বনাশ! কোহিনুর আজ তাহার স্বামীর কাছে বিশ্বাসঘাতী! যে সতীত্ব গৌরবে সে সব দুঃখ সহিয়াছিল, তার সে রত্নও তো আজ অপহৃত! একি দুর্ভাগ্য। কোহিনুর ভাবিতে লাগিল, কি করিয়া এমন হইল? সুশীলের মৃত্যুর পর হইতে সে এক একটি ঘটনা ধীরে ধীরে স্মরণে আনিতে লাগিল।—পিতার সহিত আগমন, তাহার পর মায়ের অসুখ, তৎপরে শুধু স্বামীর চিন্তামাত্র অবলম্বন করিয়া দিন অতিবাহিত করা, তারপর নিজের পীড়ার কথার স্মরণ;—তারপরে তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়া বৃন্দাবনে একরাত্রে হঠাৎ সুশীল আসিয়া দেখা দিল! কই তার পর আর তো—আর ত কিছু মনে হয় না। সেই ঘটনার পর যে স্মৃতি তাহাতে ত সুশীল নাই। কোহিনুরের যে সাধনার জীবনও ত আর নাই। এ

একটা সম্পূর্ণ নূতন যুগ। কি করিয়া এমন হইল? কোহিনুর শেষে সিদ্ধান্ত করিল সেই রাত্রি, যে রাত্রিতে সে সুশীলকে দেখিয়া ছিল, সেই রাত্রি হইতে অত্যন্ত রোগ ও শোকের প্রাবল্যে তাহার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেই মুগ্ধ অবস্থায় তাহার এ-কি সর্ব্বনাশ হইল যে, যে-প্রাণ যে-হৃদয় জনমের মত সে সুশীলকে দিয়াছিল, তাহাই লইয়া সে আবার বিনোদকে সমর্পণ করিয়াছে। সে না হয়, সব ভুলিয়াছিল; কিন্তু তাহার মাতাপিতার তো সবই স্মরণে ছিল। তাঁহাদের চির-হতভাগিনীর এই দারুণ অভাগ্যের দিনে তাঁহারাও তাহাকে শত বন্ধনের—শত মোহ-অজ্ঞানতার পথে হাত ধরিয়া তুলিয়া দিয়াছেন! আজ যে কোহি-নুরের স্বর্গ ও জগৎ দুই-ই অন্ধকার! সুশীলের কাছে আজ কি কঠিন অপরাধই না সে করিয়াছে! সুশীলের চরণে উৎসর্গীকৃত জীবনকে সে আজ কাহার পায়ে তুলিয়া দিয়াছে! তাহার চির-স্মরণীয়কে ভুলিয়া আজ কোহিনুর কাহাকে নিজের ইষ্টগুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে। কাহার সন্তানকে গর্ভে ধরিয়া সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পৃথিবীকে স্বর্গ মনে করিতেছিল!! আর তাহার প্রেমের আরাধ্য দেবতা সুশীল স্বর্গে বসিয়া তাহার এই কার্য্য দেখিতেছে!!! কোহিনুর বার বার বলিতে লাগিল—"পৃথিবী দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি। এ কলঙ্কিনীর আর জগতে মুখ দেখাইবার স্থান নাই।"

কোহিনুর যখন এইরূপে আপনার জীব-নকে শত ধিক্কার দিতে দিতে তীব্র অনুশো-চনায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িল, তখন সে যেন কাহার মৃদু শান্তিময় স্পর্শ অনুভব করিল। সে যেন গভীর সান্ত্বনা-মিশ্রিত বজ্র-গম্ভীর স্বরে কোহিনুরকে বলিতে লাগিল —'এই মর্ত্ত্যলোকের নরনারী যে অপরাধে অপরাধী তুমিও সেইরূপ অপরাধিনী। কোন বিশিষ্ট অপরাধ তোমার নাই। জগতের জীব যখন শান্তিময় রাজ্যে প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না, তখন তোমার নিকটও সে দ্বার রুদ্ধ থাকিবে না। পাইবে পাইবে—চির শান্তি। দেখ, তাবৎ চরাচরের একমাত্র স্বামী যিনি, নরনারী তাঁহাকেই তাহাদের একমাত্র পরমপতি—একমাত্র গতি জানিয়াও বিস্মৃত ও বিমুঢ়ের ন্যায় কাম, ক্রোধ লোভ, প্রভৃতি রিপুকে পতিত্বে বরণ করিয়া তাহাদের প্রেমে আপনাদিগকে ধন্য ও সৌভাগ্যশালী মনে করিতেছে। এই সকল রিপুর সংসর্গে ও সেবায় তাহারা কত চিন্তা ও কত অপরূপ কার্য্যের জন্ম দিতেছে এবং তাহাতেই যেন পরমানন্দ সম্ভোগ করিতেছে! একটী বারও তাহাদিগের জীবন স্বামীকে স্মরণ করিবার অবসর হয় না! কিন্তু ঐ আজিকার দিনের ন্যায়, যে দিন হঠাৎ—হঠাৎ—আচ-ম্বিতে তাহাদিগের এ মোহের ঘোর কাটিয়া যাইবে, অকৃত এই বিস্মৃতির যবনিকা অপসারিত হইবে, সে-দিন আর তাহারা তাহাদের ঘৃণ্য জীবনভার বহন করিতে পারিবে না; সেই জীবনস্বামীর চরণে লীন হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। আর সে মোহজ ক্রিয়াকলাপ, কাল্পনিক প্রীতির আকুলি বিকুলি শ্রবণে প্রবেশ করিবে না।'

কোহিনুর যখন এইরূপ মনোময় রাজ্যে বিচরণ করিতেছে, তখন সত্যেন্দ্রনাথ তাহার কিছুই জানেন না। কতক্ষণ পরে তিনি

তাঁহার কক্ষ হইতে ডাকিলেন, 'কোহিনুর, তোর এখনও হয় নি রে? খোকার যে কিধে পেয়েছে।' কোহিনুর কোন সাড়া দিল না। খোকার কান্নার সুর ক্রমশঃ চড়িতে লাগিল। সরোজা আবার স্নেহকোমল-স্বরে ডাকিলেন —'ও কোহিনুর!—এমন যাও তো দেখি নি বাপু! ছেলে কাঁদ্‌লে পোয়াতি এমন নিশ্চিন্ত থাকে! আয় না মা! ছেলে ঠাণ্ডা ক'রে যা করবার কর।' তবুও কোহিনুরের কোন উত্তর নাই। সরোজা ভাবিলেন, তবে হয়তো কোহিনুর কার্য্যান্তরে গিয়াছে। দাসীকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "কোহিনুর কোথা দেখ তো।" দাসী দেখিয়া আসিয়া বলিল, "মা, দিদিমণি ছাদের উপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়ে আছেন! ডাক্‌লাম, কিন্তু সাড়া দিলেন না।" "সে কি রে!" বলিয়া সরোজা শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দাসী তাড়াতাড়ি খোকাকে তুলিয়া লইল। তাঁহার যে পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা, সরোজার তাহা মনেই রহিল না! ত্বরিতচরণে ভীতিপূর্ণচিত্তে কোহিনুরের কাছে আসিয়া সরোজা ডাকিলেন—"মা আমার, এমন করে পড়ে আছ কেন?" কোনও উত্তর আসিল না। তখন সরোজা মাথার নিকট বসিয়া পড়িয়া বুঝিলেন, কোহিনুর কাঁদিতেছে! আবার নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু উত্তর দিবে কে? অনেক ডাকাডাকির পর কোহিনুরের মুখ হইতে কয়েকটীমাত্র কথা বাহির হইল—"আর কেন মা!—তোমরা আমার যা কর্‌বার তা ত খুব করেছ। বাপ্‌-মা হ'য়ে নিজের সন্তানের এমন করলে? আর তোমরা কেউ আমার কাছে এস না গো! আমি এখুনি এইখানে যেন মরি!"

সরোজা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি দিবারাত্র যে আশঙ্কা করিতেন, হায়, হায়, তাহাই ফলিল! তাঁহার মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। একেই তো তাঁর হৃৎপিণ্ডের অবস্থা অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল, অল্প-তেই মূর্চ্ছিত হইতেন, তাহার উপর আজ এই অসম্ভাবিত ঘটনায় আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দাস-দাসীরা গোলমাল করিয়া উঠিল। একজন কর্ত্তাকে ডাকিতে ছুটিল। কিন্তু কোহিনুর উঠিল না, মুখও তুলিল না।

মণিমোহন আসিয়া স্ত্রী-কন্যার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত ভীত ও বিমূঢ় হইয়া গেলেন! মুখে জল-বাতাস দিয়া সরোজা একটু সুস্থ হইলে, হঠাৎ এমন হইল কেন, কোহিনুরই বা পড়িয়া কেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। সরোজা বলিলেন, "এতদিন আমরা যা ভয় ক'রে এসেচি আজ তাই ঘটেছে! কোহিনুরের সব মনে পড়েছে!" পরে স্বামীর পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া সরোজা বলিলেন—"আজ আমার কোহিনুরের জীবনের ভার তোমার উপর; তুমি তা'কে বাঁচাও, সে ওইখানে পড়ে প্রাণত্যাগ করবে বলেছে!" কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় মণিমোহন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"হা ভগবান্‌! তোমার মনে এই ছিল!"

তিনি নিকটে গিয়াই দেখিতে পাইলেন, কোহিনুরের হাতে তখনও সেই টেলিগ্রাম রহিয়াছে। সেখানি লইয়া পড়িয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইহাকে অবলম্বন করিয়াই কোহিনুরের পূর্ব্বস্মৃতি আজ পুনরুজ্জীবিত হই-য়াছে; বলিলেন, "হায় মানব! তুমি নিজ-শক্তির গর্ব্বে এত অন্ধ! ঈশ্বরের বিধানের কাছে